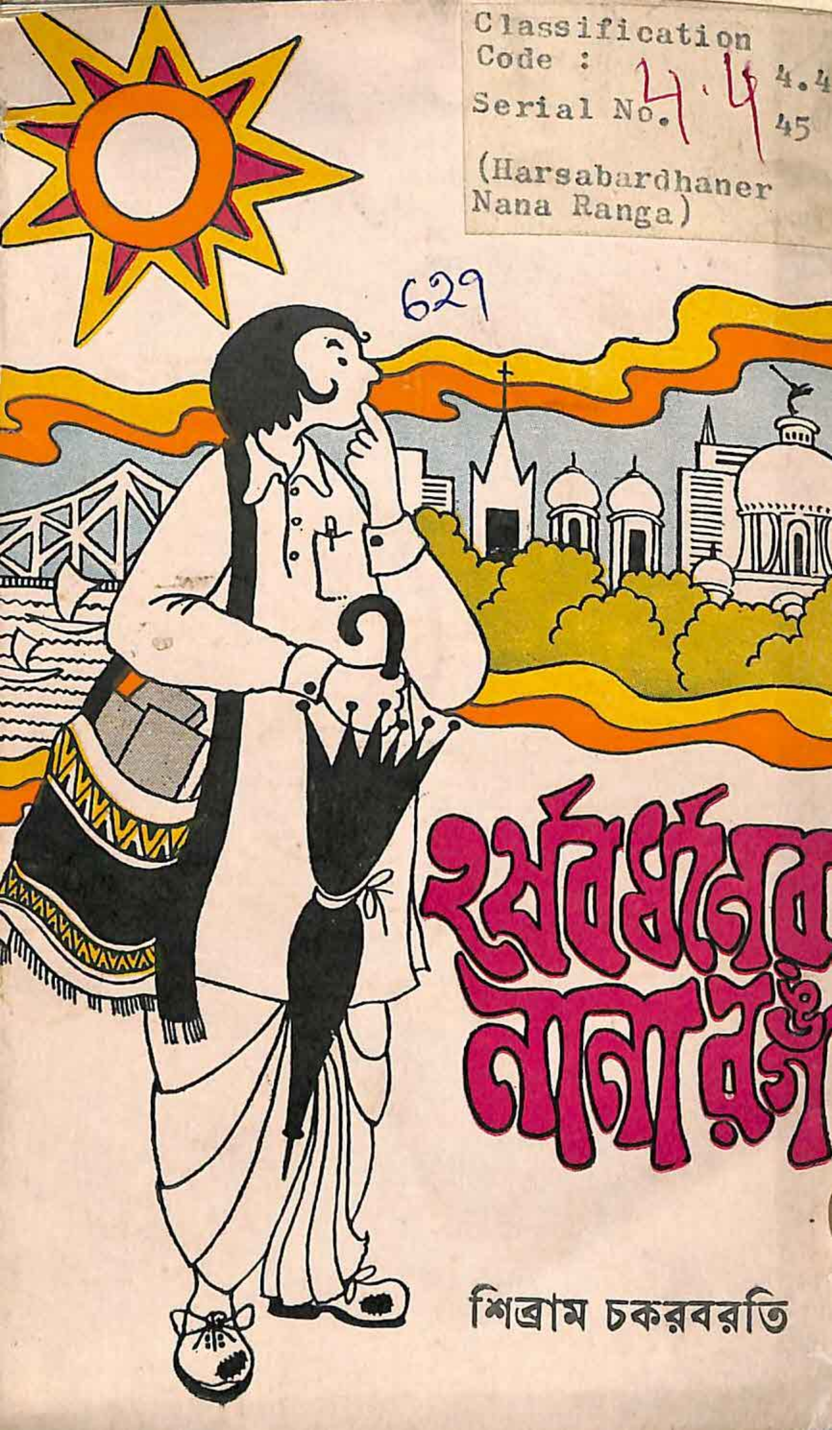

হর্ষবর্ধনের
নানা রঙ্গ
শিব্রাম চকরবরতি



হর্ষবর্ধনের নানারঙ্গ

শিব্রাম চকরবরতি

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স
কলিকাতা : নিউ দিল্লী

মূল্য ঃ সাড়ে চার টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ

শ্রীজয়ন্ত চ্যাটার্জী

৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
শান্তিমোহন হাউস, ১৬-আই/১ আনসারি রোড, দিল্লী-১১০০০২

অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স, ৫এ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭৩-এর পক্ষে শ্রীবিমল কুমার ধর কর্তৃক প্রকাশিত এবং অজন্তা প্রিন্টার্স, ৪/২ রামমোহন রায় রোড, কলিকাতা-৯-এর পক্ষে শ্রীতপনকুমার বারিক কর্তৃক মুদ্রিত।

টাকায় ক্লান্তি আসে হর্ষবর্ধনের
বিশাল বপু ভেদ করে বাজে বুঝি
সুদূরের আহ্বান
এক আজব শহরের
অদম্য আকর্ষণে গোবর্ধনকে সঙ্গে নিয়ে
ছুটে আসেন তিনি
ধাক্কা খান
খেতে খেতে এগোন
আর এদিকে শিব্রামের কলম ছোটে—
কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন

প্রথম ধাক্কা

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনবাবু দুই ভাই, কাঠের কারবারে বড় মানুষ। কর্ম-সূত্রে আসামের জঙ্গলেই চিরটা কাল কাটিয়ে এসেছেন ; এবার ওঁদের শখ হল কলকাতা শহরটা দেখবার। টাকা তো কামানো কম হয়নি, এবার কিছু কমানো দরকার। তা ছাড়া, তাঁরা কিছু ফেরারি আসামী নন যে সারা জন্মটা আসামেই কাটাতে হবে।

কলকাতা শহরটা চোখে না দেখলেও কানে যে শোনেন নি তা নয়। অনেক কিছুই শুনেছেন—অনেক দিন থেকে এবং অনেক দিক থেকে। মোটরগাড়ির কথা শুনেছেন, বড় বড় বাড়ির কথা শুনেছেন, বায়োস্কোপের কথা শুনেছেন, এমন কি ছবিতে আজ-কাল কথা কইছে এমন কথাও ওঁদের কানে এসেছে।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে কলকাতার লোকেরা নাকি তেমনি মিশুক নয়—পাশের বাড়ির খবর রাখে না, পাড়ার লোককে চিনতে পারে না। রাস্তায় বেরুলে খালি মানুষ আর মানুষ—কিন্তু আশ্চর্য এই, কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, উপরন্তু গায়ে পড়ে ভাব জমাতে গেলে বিরক্ত হয়। এমনকি অচেনা কেউ যদি তোমার গায়ে এসে পড়ে, পর-মুহূর্তেই দেখবে তোমার পকেট বেশ হাল্‌কা হয়ে গেছে। আলাপ না করলেও বিলাপ—কোনদিকেই রক্ষা নেই।

বাস্তবিক, তাঁদের কলকাতা ব্র্যাঞ্চের কর্মচারী দীর্ঘছন্দে চিঠি লিখে শহরের যা হালচাল জানিয়েছে তাতে ভয়ের কথাই বইকি। সবচেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায়—তাঁরা দুই ভাই-ই ভাব করতে ওস্তাদ—চেনা, অচেনা, অর্ধ-চেনার সঙ্গে আড্ডা জমাতে তাঁদের জোড়া নেই—সকালে, বিকেলে, দুপুরে এবং অনেক সময়ে গভীর রাত্রে অনর্গল কথা না বললে তাঁদের ভাত হজম হয় না। গল্প করতে তাঁদের এমন ভাল লাগে—সেজন্যে কাজ পণ্ড করতেও তাঁদের দ্বিধা নেই। কথা বলবার জন্যে আহার-নিদ্রা ভুলতে প্রস্তুত, অপরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে প্রস্তুত, এমনকি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পর্যন্ত পরোয়া নেইকো। কিন্তু কলকাতার লোকরা মিশুক নয় এ খবরে তাঁরা ভারি দমে গেছেন।

কিন্তু দুই ভাই মরীয়া হয়ে উঠেছেন—শহরটা একবার ঘুরে আসবেনই, যা থাকে কপালে।

বড় ভাই বলেছেন—'যদি কলকাতাই না দেখলাম, তবে ভবে এসে করলাম কী? কেবল কাঠ—কাঠ—আর কাঠ, কাঠ কি সঙ্গে যাবে?'

কাঠের প্রতি নেহাৎ অবিচার হচ্ছে দেখে ছোট ভাই মৃদু আপত্তি তুলেছিল—'না দাদা, কাঠ সঙ্গে ঠিক না গেলেও অন্তিমে কাজে লাগে।'

বড় ভাই প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছেন—'আমি না হয় কবরেই যাব, তবু কলকাতাকে একবার দেখে নেব—না দেখে ছাড়ছি না।'

এর পর আর কথা চলে না, কিংবা কথা চললেও কথা বাড়ানোর চেয়ে কলকাতা বেড়ানোর ইচ্ছা ছোট ভাইয়ের মনে তীব্রতর ছিল বলে এ ক্ষেত্রে সে চেপে যায়। অতএব একদা অতি প্রত্যুষে গৌহাটির বিখ্যাত বর্ধন অ্যান্ড বর্ধন কোম্পানির দুই বড় কর্তাকে শিয়ালদা স্টেশনে এসে অবতীর্ণ হতে দেখা গেল।

গোটা প্ল্যাটফর্মটা এধার থেকে ওধার দু'-দুবার টহল দিলেন, কিন্তু নাঃ, কর্মচারীটার দেখা নেই। কাল দু'-দুটো জরুরি তার করে জানানো হয়েছে তাঁরা যাচ্ছেন তবু হতভাগা—

গোবর্ধন বলল—'এমন তো হতে পারে সারা রাত জেগে বেচারাকে হিসেব মেলাতে হয়েছে, ভোরবেলার দিকটায় তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা যে নিতান্তই এসে পড়ব এজন্যে হয়ত সে একেবারে প্রস্তুত ছিল না—'

হর্ষবর্ধন বললেন,—'উঁহু।'

গোবর্ধন ভ্রূ কুঁচকে, যেন গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছে এইভাবে সবচেয়ে শোকাবহ দুর্ঘটনার ইঙ্গিত করল—'কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাটা কিছুতেই তহবিল না মেলাতে পেরে অবশেষে বাকি যা ছিল মেরে নিয়ে আমরা যখন শিয়ালদায় নামছি তখন সে হাওড়া দিয়ে সটকে পড়েছে?'

হর্ষবর্ধন তথাপি নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন—'উঁহুহু।'

বড় বড় গবেষণা এইভাবে পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থ হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়ে গোবর্ধন বললে, 'তবে তুমি কী ভাবছ শুনি?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—'কিছু না, কলকাতার হালচালই এই। লোকটা নেহাৎ মিথ্যা কথা লেখেনি!'

গোবর্ধন বলে—'স্বীকার করি লোকটা কলকাতার, কিন্তু তাই বলে নিজের মনিবের সঙ্গে মিশবে না—এমন কখনও হতে পারে?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের বোকামি দেখে অবাক হন—'কেন, স্পষ্টই তো লোকটাকে না মিশতে দেখা যাচ্ছে। তাকে দেখাই যাচ্ছে না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটার কথা সত্যি। এ তো হাতে-নাতেই প্রমাণ। চল্, বেরিয়ে একটা মোটর ভাড়া করিগে।'

দাদার 'লজিকে'র বহর দেখে ভাইও কম অবাক হয় না, কিন্তু নির্বাক হবার কথা তার না হলেও, কথা-কাটাকাটিতে না কাটিয়ে সময়টা মোটরে কাটালেই কাজ দেবে ভেবে আপাতত সে নিজেকে দমন করে ফেলে।

হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন, 'চিঠিখানা তোর কাছে আছে তো? বাড়ির ঠিকানা ছিল তাতে।'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'চিঠি নেই, তবে মনে হচ্ছে ১৩/১২ রসা রোড, ভবানীপুর।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত ভাবিত হন—'কেমন বাড়ি ভাড়া করেছে কে জানে! লোকটা নিজে তো মিশুক নয়ই, হয়ত এমন পাড়ায় বাড়ি দেখেছে যেখানে কথা কইতে গেলে লোকে বিগড়ে যায়। কিছু জিগেস করলে তেড়ে মারতে আসে।'

গোবর্ধন সায় দেয়—'কিংবা মেশবার ভয়ে তাও আসে না।'

'সেইটাই তো আরো ভাবনার কথা—' কিন্তু হর্ষবর্ধনের ভাবনায় বাধা পড়ে, একজন ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে—'ট্যাক্সি চাই বাবু, ট্যাক্সি?'

'যদি মোটরেই চাপি তাহলে তোমার ওই পুঁচকে গাড়িতে যাব কেন হে? গোবরা, ওই যে ভারি গাড়িখানা বেজায় ধুমধাড়াক্কা করে আসছে ওটাকে দাঁড় করা।' হর্ষবর্ধন এক বৃহদাকার ডবল ডেকারের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন, 'বড় গাড়িতে বেশি ভাড়া লাগবে, এই তো? কলকাতায় ফুর্তি করতে আসা, টাকার মায়া করলে চলবে কেন?'

শীতের প্রত্যুষে জনবিরল পথে যাত্রীহীন বাসখানা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটছিল, গোবর্ধনের সঙ্কেতমাত্র খাড়া হোল। হর্ষবর্ধন উঠেই হুকুম দিলেন—'চালাও তোমার তেরোর বারো রসা রোড। কোথায় জানা আছে তো?'

কণ্ডাক্টর জবাব দেয়—'আমাদের তিন নম্বর বাস ওইদিকেই তো যায়।'

মনিব্যাগ থেকে একখানা একশ টাকার নোট বার করে হর্ষবর্ধন তার হাতে দেন। কণ্ডাক্টর জানায়—'কিন্তু এর চেঞ্জ তো নেই!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'দরকার নেই চেঞ্জ দেবার; পুরোটাই ওর ভাড়া ধরে নাও। চিরকাল মোটর-গাড়ির গল্প শুনে আসছি, আজ সুযোগ হয়েছে, শখ মিটিয়ে চাপব। যত টাকাই লাগুক, কেয়ার করি না আমরা।'

এতক্ষণে গোবর্ধন কথা বলবার ফুরসৎ পায়—'দিব্যি গাড়ি দাদা, দেখছ কতগুলো সীট, তার ওপরে গদিমোড়া। আবার হাওয়া খেলবার জন্যে এতগুলো জানলা! একটা বড়ো আয়নাও রয়েছে সামনে! এমনি একটা মোটর দেশে নিয়ে যাব, কী বল দাদা? মোটরগাড়ি আর মোটর-বাড়ি একসঙ্গে!'

'আলবৎ! দেশে নিয়ে যেতে হবে বইকি! যদি চেনা লোকের চোখেই না পড়লাম তবে মোটরে চেপে লাভ কী হোলো?'

'এখন যে-কদিন কলকাতায় আছি গাড়িখানায় চাপা যাবে, কী বল দাদা?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—সে কথা বলতে? সাত দিনের জন্যে এটাকে ভাড়া করে ফেলছি এক্ষুনি।'

হঠাৎ বাস দাঁড়াল এবং একটি তরুণী ভদ্রমহিলা উঠলেন। হর্ষবর্ধন একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ফিস্‌ফিস্ করে গোবর্ধনকে বললেন—'উঠেছে উঠুক, কিছু বলিস নে। মেয়েটা যদি খানিকটা মোটরের হাওয়া খেতে চায় ঘুরে—খাক না, ক্ষতি কি; জায়গা যথেষ্টই আছে।'

তরুণীটি একটি সিকি বের করে কন্ডাক্টরের হাতে দিতে গেল। হর্ষবর্ধন বাধা দিলেন—'পয়সা কিসের?'

'খিদিরপুরের ভাড়া।'

'আপনার সিকি আপনি নিজের কাছে রেখে দিন, ওটি আমরা হ'তে দিচ্ছি না! আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছেন, আমাদের সৌভাগ্য, সেজন্যে কোন পয়সা নিতে আমরা অক্ষম।' ব'লে হর্ষবর্ধন গম্ভীরভাবে গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে নিলেন।

মেয়েটির বিস্ময় কমতে না কমতেই আবার বাস দাঁড়াল এবং একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি উঠলেন। যেমনি না তিনি মনিব্যাগের মুখ খুলেছেন অমনি গোবর্ধন গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—'মাপ করবেন, পয়সা নিতে পারব না। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন, আরাম করে হাওয়া খান—তার জন্যে ভাড়া দিতে দেব না আপনাকে। মনে করুন এটা আপনার নিজের গাড়ি।'

গোবর্ধনের নিজের গোঁফ ছিল না, চাড়া দেবার জন্যে দাদার গোঁফ ধার নেবে কি না ভাবল একবার।

দু' মিনিটের মধ্যে আরো গোটা তিন ভদ্রলোক, দুটি অত্যন্ত মোটা সোটা মেয়েছেলে এবং আধ ডজন ফচ্‌কে চ্যাংড়া গাড়িতে প্রবেশ করল। এবার হর্ষবর্ধনের কপালে রেখা দেখা দিল এবং গোবর্ধনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল; বড় ভাইকে চাপা গলায় প্রশ্ন করলো—'কে বলছিল গো কলকাতার লোকেরা মিশুক নয়?'

কিছুক্ষণেই বাস বোঝাই হয়ে গেল, হর্ষবর্ধন প্রত্যেক অভ্যাগতকেই সাদরে অভ্যর্থনা করছিলেন এবং তাদের ভাড়া দিতে নিরস্ত করতেও তাঁকে কম বেগ পেতে হচ্ছিল না। লোকগুলোর অপব্যয়-প্রবৃত্তি দেখে গোবর্ধন আর বিস্ময় দমন করতে না পেরে দাদাকে নিজের অভিমত জানাল—'কলকাতার লোকগুলো ভারি খরচে কিন্তু দাদা!'

'চলে আসুন। জায়গা যথেষ্টই রয়েছে। আরামে হাওয়া খান। একটি পয়সাও দিতে হবে না। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা অনুগ্রহ করে আমাদের গাড়িতে আসছেন।' হর্ষবর্ধন থামবার ফুরসৎ পান না।

আরও প্যাসেঞ্জার উঠতে লাগল, বাসের দু'ধারের সীট ভর্তি হয়ে গেল, এমনকি মাঝামাঝি দু'থাক লোক গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গেল,—দরজা, ফুট-বোর্ড পর্যন্ত ভর্তি হবার দাখিল। অবশেষে একজন চীনাম্যান ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়তেই গোবর্ধন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছে—'দাদা, দাদা, দেখ দেখ, এক চীনাম্যান!'

দাদা অদৃষ্টপূর্ব এবং ইতিহাস-বিশ্রুত হুয়েন-সাং ফা-হিয়েনের বংশ-ধরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে গুরুগম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন—'হুঁ, ওদের দাড়ি হয় না বটে!'

গোবর্ধন যোগ করে—'হ্যাঁ দাদা! কামাবার হাঙ্গামা নেই—ওরাই এ জগতে সুখী!'

এমন সময়ে কন্ডাক্টর জানাল যে রসা রোড এসে পড়েছে। দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে ঠেলে-ঠুলে কোন রকমে নেমে পড়লেন, নামবার আগে ঘোষণা করলেন—'ওহে, যতক্ষণ এঁরা চাপতে চান চাপুন, যেখানে এঁরা যেতে চান নিয়ে যাও এঁদের। আরও যা টাকা লাগে আমাদের ঠিকানায় এসে নিয়ে যেয়ো—তেরোর বারো রসা রোড, বুঝলে? আর আপনারা, বন্ধু-গণ, বিদায়! আরামে ঘুরুন সারা দিন, যত খুশি, যতক্ষণ খুশি! কারুর একটি পাই পয়সা লাগবে না।'

বাস থেকে নেমেই গোবর্ধন প্রশ্ন করল—'কলকাতার হালচাল কী রকম বুঝলে দাদা?'

'হ্যাঁঃ! কে বলে কলকাতার লোকরা মিশুক নয়? একেবারে মিথ্যা কথা, বাজে কথা, ভুয়ো কথা! মেশামেশির ধাক্কায় আমার দম আটকে যাবার জোগাড় হয়েছিল! শেষকালে একটা চীনাম্যান পর্যন্ত—! আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সাহেব-সুবোরাও এসে উঠত! এমনকি মেমরাও। বাপ রে বাপ! এ রকম গায়ে পড়া মিশুক লোক আমি দুনিয়ায় দেখি নি! কিন্তু একটা সর্বনাশ হয়েছে—'

গোবর্ধন ব্যস্ত হয়ে ওঠে—'কী? কী? পকেট মেরেছে নাকি?'

'উঁহু। আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে ফেলেছি ওদের। ভারি মুস্কিল করেছি। খপ্ করে বাড়ি ঢুকেই খিল এঁটে দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় বাড়ির চারধারে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে দেওয়া ভাল। তাতে অনেকটা নিরাপদ। কলকাতার লোক যে-রকম মিশুক দেখছি, বাড়ি চড়াও হয়ে আমাদের সঙ্গে খেতে-শুতে না চেয়ে বসে, কী জানি!'

দ্বিতীয় ধাক্কা

চওড়া ফুটপাথে উঠেই হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন—'কাকে জিজ্ঞাসা করি?' এইমাত্র তিনি গোবর্ধনকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন, তার চেয়েও গুরুতর ভাবনা তাঁর কাঁধে ভর করে—কলকাতার মত শহরে এত ঘর-বাড়ির মধ্যে নিজের 'থাক্‌তব্য' জায়গার খোঁজ করা কী কষ্টসাধ্য—কী ভীষণ ঝকমারি! এই সমস্ত নিদারুণ মিশুক লোকদের মাঝখানে শেষে কি ফুটপাথেই দিনরাত কাটাতে হবে?

গোবর্ধন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

'বাড়ির ঠিকানা বাগাবার কী হবে রে?' হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন।

গোবর্ধন জবাব দেয়—'কেন, বাড়ীর ঠিকানা তো পাওয়াই গেছে, এখন ঠিকানার বাড়ি বল!'

'ওই একই কথা, একই কথা হলো। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাকে?'

গোবর্ধন যোগ দেয়—'নিরাপদও তো নয় জিজ্ঞাসা করা! যদি এখন খুড়ো, জ্যাঠা, মাসি, পিসি, মামা, মাস-শাশুড়ি সব নিয়ে এসে হাজির হয় আমাদের বাড়ি? যে রকম সব মিশুক দাদা!'

'হুঁ!' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন—'বাড়িতে ভারি গোলমাল হবে তাহলে।'

গোবর্ধন আরো বেশি মাথা নাড়ে—'নিজেরা সমস্ত ভাড়াটা গুণে শেষে চৌকির তলাতেও শোবার ঠাঁই পাব কি না সন্দেহ!'

'তবে?' হর্ষবর্ধন মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন দাদার দিকে তাকায়—'ফুটপাথে লাট্টু ঘোরাচ্ছে, ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করব?'

'নিরাপদ তো?'

'না-হয় যত রাজ্যের ছেলে—ওর বন্ধুদের সব জুটিয়ে আনবে, এই তো? তা আনুকগে। ছেলেরা বাড়ির মধ্যে থাকতে খুব কমই ভালবাসে। একবার বাইরে ছাড়া পেলে হয়—তারপর গড়ের মাঠ বলে কি একটা দেদার ফাঁকা জায়গা আছে না কলকাতায়? তুমিই তো বলছিলে গো?'

'সনাতনখুড়োর কাছে শুনেছিলাম বটে। কিন্তু কোন্‌দিকে জানি নে তো।'

'সেটা জেনে নিয়ে একটা কোন খেলার ছুতো করে ছেলেদের সব ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে গড়ের মাঠের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।'

হর্ষবর্ধন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আদেশ দেন—'তবে ওকেই বল্‌, তাহলে।'

দু'জনে লাট্টু-নিরত খোকার দিকে অগ্রসর হন—গোবর্ধনই সাহস সঞ্চয় করে—'ওহে খোকা, শোন তো এদিকে!'

খোকার দিক থেকে তীক্ষ্ম জবাব আসে—'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না!' না তাকিয়েই সে জবাব দেয়।

গোবর্ধন ভড়কে যায়, কিন্তু দাদা পাশে থাকতে ভয়ের কী আছে, এই ভেবে মরীয়া হয়ে ওঠে, তার কম্পিত কণ্ঠ শোনা যায়—'তবে কী বললে তুমি সাড়া দাও শুনি?'

'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না। দেব কেন? আমি কি খোকা? খোকা তো যারা দুধ খায়।' ছেলেটির স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ পায়।

ব্যাপার সহজ নয় বিবেচনা করে এবার হর্ষবর্ধন নিজেই আগুয়ান হন—'ওহে বালক! খোকা বলা তোমাকে খারাপ হয়েছে আমরা মেনে নিচ্ছি, এখন বল তো এখানে এত সব বাড়ির ভেতর তেরোর বারো কোন্‌টি?

হর্ষবর্ধনের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বালকের 'লাট্টুশীলতা' তৎক্ষণাৎ থেমে যায়—'কী বললেন, তেরোর বারো?'

'হ্যাঁ, তেরোর বারো কিংবা ত্রয়োদশের দ্বাদশ—যেটা তোমার বুঝবার পক্ষে সুবিধে।'

ছেলেটি আর বিস্ময় দমন করতে পারে না—'কী করে জানলেন? আমিই তো! আমারই বয়স তেরো, ইস্কুলে বারো লিখিয়েছে!'

এমন সময়ে পাশ দিয়ে একটা পরিচিত সাইকেল যেতে দেখে ছেলেটি হর্ষবর্ধনের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই মুহূর্ত মধ্যে তার পেছনের ক্যারিয়ারে চেপে বসে এবং পরমুহূর্তেই বালক ও সাইকেল-চালক দু'জনেরই টিকি এত দূরে দেখা যায় যে উচ্চৈঃস্বরে জবাব দেবার কোন সঙ্গত কারণ হর্ষবর্ধন খুঁজে পান না।

'গোবরা, বুঝলি কিছু?'

'উঁহু!'

'তোর ঘটে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই দেখছি!'

গোবর্ধন এবার চটে—'বুঝব না কেন? অনেক আগেই বুঝেছি, বুঝবার এতে এমন কী আছে? কলকাতার সাইকেলের পেছনগুলো সব ছেলেদের জন্যে রিজার্ভ করা, এই তো? যে-কোন ছেলে যখন খুশি চাপলেই হল।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তা হতে পারে। কিন্তু ছেলেটারও নম্বর তেরোর বারো—তা কিছু বুঝেছিস? যেমন ঘর-বাড়ির, তেমনি কলকাতার প্রত্যেক ছেলেরই একটা করে নম্বর আছে—মার্কামারা ছেলে সব!'

বলে হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন। অনন্যোপায় গোবর্ধন দাদার সঙ্গে

সমান পাল্লা দেবার প্রয়াসে একবার দাড়ি চুলকে নেয়—'থাকবেই তো নম্বর। কেন, কলকাতায় ছেলের কি কিছু কম্‌তি? এই যত লোক দেখছ তাদের প্রত্যেকের গড়-পড়তা চারটে-পাঁচটা করে ছেলে—আবার কারু-কারু চোদ্দ পনেরটাও আছে। এত লাখ-লাখ ছেলের মধ্যে পাছে হারিয়ে যায় কি গুলিয়ে যায়—বাপ মা-রা না খুঁজে পায় সেইজন্যেই এই নম্বর দেওয়া! এ আর আমি বুঝি নি? তোমার ঢের আগেই বুঝেছি।'

'আমার আগেই বুঝেছিস?' হর্ষবর্ধনের গোঁফ হস্তচ্যুত হয়—'বটে? তাহলে তুই আমার আগেই জন্মেছিস্, তাই বল্? আরে মুখ্য, আগে না জন্মালে কখনো আগে বোঝা যায়? তাহ'লে আমার এই ইয়া গোঁফ—তোর কোনো গোঁফ নেই কেন?'

এমন জাজ্বল্যমান উদাহরণের বিপক্ষে গোবর্ধনের বাক্‌বিতণ্ডা অগ্রসর হবার পথ পায় না। কিন্তু হর্ষবর্ধন কি থামবার! 'বড় শক্ত জায়গায় এসে পড়েছিস গোবরা, বুদ্ধি একদম না খেলাতে পারলে কোনদিন তুই মারা পড়বি এখানে। চাই কি, তোকেও নম্বর দেগে দিতে পারে—এখনো তুই ছেলেমানুষ তো! কিন্তু আমার আর সে ভয় নেই।'

হর্ষবর্ধন পুনরায় গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন। গোবর্ধন প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করে—'ম্যানেজারের চিঠিটার মানে বুঝেছ? বালক লিখতে ভুলে লোক লিখে ফেলেছে। কলকাতার বালকরাই মিশুক নয়। দেখলেই তো—সাইকেলে চেপে সটান চোখের ওপর সটকান দিল!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তোরও যেমন বুদ্ধি তারও তেমনি! আমরা কি এত পয়সা খরচ করে বালকের সঙ্গে মিশবার জন্যেই কলকাতায় এসেছি নাকি? এ রকম ভয় দেখাবার মানে? ব্যাটাকে দেখতে পেলেই ডিসমিস করব! আমরা প্রবীণ, প্রাজ্ঞ, প্রাপ্তবয়স্ক লোক—বালকদের সঙ্গে মিশতে যাবই বা কেন? দূর দূর!'

হঠাৎ গোবর্ধন দাদার পিলে চমকে দেয়—'ঐ যে দাদা! আমাদের পাশেই যে তেরোর বারো!'

হর্ষবর্ধন পাশ ফিরে দেখেন, সত্যিই তো, তেরোর বারোই তো বটে! বাঁ-হাতি সম্মুখ বাড়িটার গায়ে পরিষ্কার করে নম্বর দাগা—১৩/১২, বারোটাকে স্পষ্ট করবার জন্যেই মাঝে দাঁড়ি দিয়ে দু' ভাগ করে দিয়েছে তাতে হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থাকে না। হঠাৎ তাঁর মনে এত পুলকের সঞ্চার হয় যে তিনি ভাইয়ের সমস্ত বোকামি মার্জনা করে দেন। বুদ্ধিহীনতা যতই থাক, দৃষ্টিক্ষীণতা নেই গোবরার।

'ও বাবা! এ যে প্রকাণ্ড বাড়ি! দু'জনে এতগুলো ঘরে শোবই বা কী করে?'

'আজ এ-ঘরে, কাল ও-ঘরে এই করলেই হবে।' গোবরা যেন সমস্যার সমাধান করে—'সব ঘরগুলোই চাখতে হবে তো একে-একে। তুমি একটায় শুয়ো, আমি একটায় শোব।'

'উঁহু!' হর্ষবর্ধন প্রবল প্রতিবাদ করেন—'সেটি হচ্ছে না, আমার ভূতের ভয় করবে তাহলে। তোকে আমার কাছে-কাছে থাকতে হবে। এত বড় বাড়িতে রাত্রে একলা থাকা আমার কম্ম না!'

দুঃসাহসী গোবর্ধন দাদার দুর্বলতার সুযোগে একটু মৃদু হাস্য করে নেয়। 'বেশ, তোমার কাছেই থাকব আমি। কিন্তু তুমি আমায় যখন-তখন বোকা বলতে পারবে না—তা বলে দিচ্ছি।'

'দূর, তুই বোকা হতে যাবি কেন? আমার ভাই কখনো বোকা হয়!' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দেন—'ছেলেটা যেমন খোকা নয়, তুইও তেমনই বোকা নয়।'

দাদার বিরাট পৃষ্ঠপোষকতায় পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয় গোবর্ধন—'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। ফের আমাকে বলেছ কি আমি অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছি। কি ছাতেই শুয়ে থাকব গিয়ে, দেখো!'

হর্ষবর্ধনের কন্ঠ করুণ হয়—'বিদেশে বিভুঁয়ে এসে অমন করিসনে গোবরা। ভূতের তাড়ায় কোনদিন হয়ত জানলা টপ্‌কে রাস্তাতেই লাফিয়ে পড়তে হবে আমায়! বিদেশে এসে বেঘোরে প্রাণটা যাবে তাহলে! আচ্ছা, এই কথা রইল, তুই যদি একগুণ বোকা হোস আমি একশো গুণ বোকা। তাহলে হবে তো?'

'না, তুমি তাহ'লে হাজার গুণ।' গোবরা গম্ভীরভাবে বলে।

'বেশ, তাই।' হর্ষবর্ধনের মুখ ম্লান হয়ে আসে।

দাদার মিত্রয়মানতায় গোবর্ধনের দুঃখ পায়—'আমি হলে তবে তো তুমি হবে। আমি একগুণও না, তুমি হাজার গুণও না।'

মিনিটের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায় দুই ভাইয়ের।

অতঃপর দুই ভাই দরজার সম্মুখে সমাগত হন। দরজায় প্রকান্ড ভারি তালা লাগানো। এত কষ্ট করে কলকাতায় এসে গৃহদ্বারে যে এভাবে অভ্যর্থনা লাভ করবেন হর্ষবর্ধন এ রকম আশঙ্কা কোনদিন করেন নি। ঘরে না ঢুকতে দোর গোড়াতেই এই তালাক—এ কী! তিনি ভারী মুষড়ে পড়েন।

গোবরা বলে—'ভেঙে ফেলব? কী বল দাদা? যখন ভাড়া দেব তখন তো আমাদেরই বাড়ি এখন!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'ভেঙে ফেলবি, চৌকিদার কিছু বলবে না তো?'

গোবরা জবাব দেয়—'কলকাতায় আবার চৌকিদার আছে নাকি?' তবু একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়; 'তিনতালা বাড়ির যদি

ভাড়া গুণতে পারি তাহলে সামান্য একতালা ভাঙার দাম দিতে পারি না নাকি?'

'তবে ভেঙেই ফ্যাল্!' হর্ষবর্ধন হুকুম দিয়ে দেন।

গোবর্ধন প্রবল পরাক্রমে তালার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে, কিন্তু অল্পক্ষণেই তার বোধগম্য হয়, অসামান্য তালাকে সামান্য জ্ঞান করা তার অন্যায় হয়েছে। মোটা তালাটা যে-দুটি কড়াকে করায়ত্ত করে রয়েছে সে-দুটি অতি ক্ষীণকায়, অগত্যা গোবর্ধন তালাকে তালাক দিয়ে কড়া ধরেই কাড়াকাড়ি শুরু করে দেয়। কিন্তু কেউ ছাড়বার পাত্র নয়। গোবর্ধন ঘেমে, নেয়ে, হাঁপিয়ে বসে পড়ে।

হর্ষবর্ধন এবার দরজার ওপর নিজেই পদাঘাত আরম্ভ করেন। দরজা প্রবল প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু এক ইঞ্চি হটে না—হটবার কোন মতলবই দেখায় না। কাঠের কী কঠোর দুর্ব্যবহার!

তাঁর বিরক্ত কণ্ঠ থেকে বহির্গত হয়—'দূর ছাই! এ কি ভাঙবার দরজা! কলকাতায় ভালো কাঠ রপ্তানি করার ফল দ্যাখ্ গোবরা, আমাদের কাঠ আমাদের সঙ্গেই শত্রুতা করছে! ছ্যা ছ্যা!'

গোবরা গুম হয়ে থাকে।

হর্ষবর্ধন বলতে থাকেন—'এবার থেকে কাঠ পচিয়ে ঘুণ ধরিয়ে পাঠাব তেমনি। আমাদের ম্যানেজার কি আর সাধে বার-বার করে লিখে পাঠায় যে কলকাতায় ভালো কাঠ পাঠাবেন না, পাঠাবেন না, এখানে ভালো কাঠ চালিয়ে তেমন লাভ নেই ; খেলো কাঠ পাঠালে ভালো হয়! এখন তার মানে বুঝছি! হুঁ, হাড়ে-হাড়ে বুঝছি!' দরজার পরাকাষ্ঠার সামনে তিনি পাদচারণা শুরু করেন।—'প্রতি পদক্ষেপে টের পেয়েছি।'

গোবর্ধনের প্রাণে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়—'আচ্ছা দাদা, বাড়ির গা দিয়ে একটা লোহার পাইপ দেখলাম না—সটান গিয়ে ছাদে উঠেছে?'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো।'

'আমি ওই ধরে ছাদে উঠি গিয়ে, তারপর নেমে এসে ভেতর থেকে একটা জানলা খুলে দেব, তুমি তখন ঢুকো, কেমন?'

'পারবি উঠতে?'

'তালগাছে ওঠা আমার অভ্যাস, নারকোল গাছেও উঠেছি। খেজুর গাছেই কেবল উঠিনি কখনো।' সে কয়ঃ 'খেজুর কাউকে গায় পড়তে দেয় না তো! গায়ে যা কাঁটা!"

তখন দুই ভাই বাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান। হর্ষবর্ধন পাইপের গতিবিধি পুঙখানুপুঙখ পর্যবেক্ষণ করেন—'হ্যাঁ ছাদ পর্যন্তই গেছে বটে। কিন্তু পাইপ বেয়ে ওঠা কি সোজা রে? পারবি তো?'

গোবর্ধন বলে—'ওঠার চেয়ে নামাই সুবিধে বোধহয়। সর-সরিয়ে নেমে পড়লেই হল।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'তা বটে। কিন্তু না উঠলে নামবি কী করে?'

'তাই করি, কী বল দাদা? বারকতক উঠি আর নামি, কেমন? বেশ মজা হবে।'

'হুঁ, খুব ভালো একসাইজ। ওতে তোর সাইজও বাড়বে। ডবোল হয়ে যাবি। দুসাইজ হয়ে যাবে তোর। কাল থেকে ওটা করিস, আজ একবার উঠেই চট্ করে জানালাটা খুলে দে বরং। কেবল রেলে চেপে চেপে তখন থেকে গা ঝিম্-ঝিম্ করছে। ভেতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক ততক্ষণ। কিন্তু দেখিস, সাবধান, পা ফস্কে পড়ে যাস না যেন।'

গোবর্ধন পাইপস্থ হয়। যুগপৎ তার হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপ চলতে থাকে। হর্ষবর্ধন হাঁ করে তাকিয়ে দ্যাখেন।

ছোঁড়াটা আবার গড়িয়ে পড়ে গড়বড়িয়ে না যায়।

তৃতীয় ধাক্কা

পাইপ-পথে গোবর্ধন ঊর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়, হর্ষবর্ধন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন—কখন জানলা-যোগে গৃহপ্রবেশের আমন্ত্রণ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যায়, তবু গোবর্ধনের দেখা নেই। হর্ষবর্ধনের ভয় হয়, অত বড় বাড়িতে হারিয়ে গেল না তো ছোকরা! ভাবতে থাকেন, কী সর্বনাশ দেখ! ঐ প্রকান্ড বাড়ির মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা কি সোজা কথা! আর তাছাড়া খুঁজবেই বা কে! এত বড় ভুঁড়ি নিয়ে ঐ খাড়া পাইপ বেয়ে ওঠা হর্ষবর্ধনের কম্ম নয়। শেষটা কি ভাই খুইয়ে আসামীর মতই তাঁকে আসামে ফিরে যেতে হবে নাকি! তাঁর চোখ-মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে।

কিন্তু না—একটু পরে একতলার একটা জানলার ছিটকিনি খুলে যায়। গোবর্ধন বত্রিশ পাটি বহিষ্কৃত করে দাদাকে অভ্যর্থনা জানায়। হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে, কিন্তু গোবর্ধনের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়—'তোমার পেছনে ও কী দাদা?'

হর্ষবর্ধন পেছনে তাকিয়ে দেখেন, বিরাট জনতা। তারা যে গোবর্ধনের পাইপ-লীলা দেখবার জন্যেই দাঁড়িয়েছিল একথা তাঁর মনে হয় না,—

মুহূর্তের মস্তিষ্ক-চালনায় যে বিপজ্জনক আশঙ্কার আভাস তাঁর চিত্ত-লোকে চমকে যায় তারই আতঙ্কের ধাক্কায় তিনি পড়ি-কি-মরি হয়ে জানলার দিকে হন্যে হন। ছুটে গিয়ে জানলার অভিমুখে দুই হাত বাড়িয়ে দেন, আঁকড়ে উঠবার চেষ্টা করেন—কিন্তু কেবল হাতাহাতি করাই সার, জানলা তাঁকে আদপেই আমল দিতে চায় না। জানোয়ার বলে এত-দিন যাদের ঘৃণা করে এসেছেন, মনুষ্যপদ-বাচ্য হর্ষবর্ধন এখন তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হন—হাতকে পায়ের মত ব্যবহার করার দুর্লভ কায়দা কেবল তারাই করতলগত করেছে।

গোবর্ধন দাদার সাহায্যে অগ্রসর হয়—দাদার করমর্দন করে। গোবর্ধনের চেষ্টা থাকে দাদাকে টেনে তুলতে, দাদারও চেষ্টা থাকে ঠেলে উঠতে কিন্তু পৃথিবীর দুশ্চেষ্টা থাকে হর্ষবর্ধনকে ধরাশায়ী করবার। গোবর্ধন এবং মাধ্যাকর্ষণের ভেতর তুমুল পাল্লা চলে—হর্ষবর্ধন বেচারার প্রাণান্ত হয়। তিনি বাঁচলেও তাঁর ভুঁড়ি বোধহয় বাঁচে না এ-যাত্রা আর! এ রকম অবস্থায় মরীয়া হয়ে উঠতে মানুষের কতক্ষণ? জলে পড়লে হর্ষবর্ধন যেমন কুটোকে অবলম্বন করতে দ্বিধা করতেন না, স্থলে পড়ায় এখন তেমনি গোবর্ধনকে কুটো জ্ঞান করে ঝুলে পড়লেন। গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হয়।

হর্ষবর্ধন বলেন,—'পড়লি তো? এই ভয়ই করছিলাম আমি! গায়ে যদি হতভাগার একটুখানিও জোর থাকে!'

গোবর্ধন সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

'আবার তো সেই পাইপ বেয়েই উঠতে হবে? সে কি চারটিখানি কথা?'

গোবর্ধন বলে, 'আচ্ছা, আমি না হয় পাইপ বেয়েই উঠব, তুমি কিন্তু এক কাজ কর। আমি কুঁজো হচ্ছি, তুমি আমার পিঠে চড়ে উঠে পড় না!'

'পারবি তো?' হর্ষবর্ধন দ্বিধা বোধ করেন, 'দেখিস, পৃষ্ঠ-ভঙ্গ না হয়ে যায়। বাড়ি গেলে বাড়ি পাব, দাড়ি গেলে দাড়িও পাওয়া যায় কিন্তু তুই গেলে আর তোকে পাব না।' হর্ষবর্ধনের মুখের ভাব ভারী হয়ে আসে।

"তুমি ওঠ না দাদা!' গোবর্ধন দাদাকে উৎসাহিত করে, 'এ কুঁজো সে কুঁজো নয়। একি সহজে ভাঙবার? এ তোমার সেই মাটির কুঁজো না!'

'তাহলে উঠছি কিন্তু! উঠি?' হর্ষবর্ধন বারংবার পুনরুক্তি করেন—গোবরা বারংবার অনুমতি দেয়। অবশেষে আর কোন উপায় না দেখে পিঠের উপর একটা পা রাখেন, তখনই ফের নামিয়ে নেন ; আবার পদ-ক্ষেপ করেন, কেমন মায়া হয়, আবার নামিয়ে নেন।

মাটির কুঁজো নয় কিন্তু ধপাস হলেই সব মাটি।

'তাড়াতাড়ি কর দাদা!' গোবর্ধন ফিস্‌ফিস্ করে—'দেখছ না, কত লোক দাঁড়িয়ে গেছে!'

'ওদের মৎলব বুঝেছি।' হর্ষবর্ধন জবাব দেন।

'বিনে পয়সায় সার্কাস দেখে নিচ্ছে!'

'উঁহু, তা নয়। বাড়ির ভেতরে যাই, বলছি তারপর।'

'দাদা, ভারি দেরি করছ তুমি! লোকগুলো তেড়ে না আসে শেষটায়!' গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে ভয় দেখায়।

লোকগুলো তাড়া করতে পারে এ রকম দুঃসম্ভাবনা হর্ষবর্ধনেরও মনে হয়েছে। সুতরাং তিনি কাল-বিলম্ব করেন না, গোবর্ধনের পিঠের উপর চেপে বসে পড়েন, তারপর আর দাঁড়াতে বড় দেরি হয় না—জানলাও সহজে তাঁর নাগাল পায়। হর্ষবর্ধন-ভারে গোবর্ধন যেন আরো ঝুঁকে পড়ে—হয়ত না-মাটির কুঁজোও ভাঙবার মত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রুখে ওঠবার তরফে তার চেষ্টা থাকায় কোন রকমে ভারসাম্য হয়ে যায়।

জানলার অন্তরালে দাদার মহাপ্রস্থানের পথে গোবর্ধন একটা ঝোঝুল্যমান ঠ্যাং ধরে ফেলে। হর্ষবর্ধন ঠ্যাং নিয়ে ওঠেন, মানে, অগত্যা তাঁকে উঠতে হয়, তখন আর অন্য উপায় কী! গোবরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায়—অবলীলাক্রমে।

'দেখলে, কেমন দুজনারই ওঠা হল!' গোবরা বলে। 'পা দিয়েই পাইপের কাজ সারলাম।'

হর্ষবর্ধন সে কথার কোনো জবাব দেন না, অনাহত ভুঁড়ি এবং আহত পায়ের শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে হয়—'কী সর্বনাশ! এখনও খুলে রেখেছিস? বন্ধ করে দে জানলা!'

গোবর্ধন ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে জানলা বন্ধ করে। 'কেন? লাফিয়ে আসবার ভয় করছ ওদের?

'করছিই তো! ওরা কারা, এখনো বুঝতে পারিস নি বুঝি?'

'না তো!' গোবর্ধন মূঢ়ের মত তাকায়।

'সেই বাসের যত লোক!'

'অ্যাঁ?' গোবর্ধন তাড়াতাড়ি একটা খড়খড়ি ফাঁক করে দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেয়—'সত্যিই তো! সেই চীনেম্যানটা পর্যন্ত রয়েছে দাদা! দলে বেশ ভারি হয়ে এসেছে এখন!'

'এখানে থাকবার মৎলবে!' হর্ষবর্ধন রহস্যটা ফাঁস করে দেন। 'বুঝেছিস? বিলকুল বিনে ভাড়ায়!'

গোবর্ধন অসন্তোষ উন্মুক্ত করে—'গাড়ি চড়লি—অমনি অমনি হাওয়া

খোল—হল। তার ওপর আবার বাড়ি চড়াও? আবদার তো কম না এদের!'

হর্ষবর্ধন জানলায় খিল এ'টে দেন—'আর ভয় নেই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'থাক দাঁড়িয়ে সব। কতক্ষণ আর থাকবে?'

'পাইপ বেয়ে উঠবে না তো?' হর্ষবর্ধনের আশংকা হয়। 'কী মনে করিস তুই?'

'উঠ্‌ক গে।' গোবরা দাদাকে ভরসা দেয়, 'চল আগে থেকে ছাদের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। থাকতে চায় থাকুক গে ছাদে। বাড়িতে ঢ্‌কতে দিচ্ছি না তো—হ্যাঁ!'

দ্‌ই ভাই তড়িৎগতিতে সি'ড়ি অতিক্রম করতে থাকেন। সর্বোচ্চ দরজাটি অর্গলিত করে তবে দ্‌'জনের দ্‌শ্চিন্তা দ্‌র হয়।

গোবরা বলে চলে—'এখন পাইপ বেয়ে ওঠ আর পাইপ বেয়ে নাম! বাড়িতে ঢোকার ফাঁক রাখি নি বাপ্‌! চীনেম্যান নিয়ে এসে ভয় দেখানো হচ্ছে আমাদের! বটে? এবার চীনেম্যানগিরি বেরিয়ে যাবে সব।'

হর্ষবর্ধন কিছ্‌ বলেন না, নীরবে হাঁপান।

অনন্তর দ্‌ই ভাই বিভিন্ন ঘর পরিদর্শনে বহির্গত হন। প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালঙ্ক, দেরাজ, ডেস্ক, আয়না ও আলমারি, নানা প্যাটার্নের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নানান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি।

'আমাদের দামি দামি কাঠ কিনে এনে ভেঙে চুরে ট্যারা বাঁকা করে কী সব করেছে দেখেছিস?' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের অভিমত জানতে চান।

গোবর্ধন ঠোঁট বাঁকায়—'কাঠের শ্রাদ্ধ কেবল!'

'সোজাস্‌জি চৌকি করলি, ট্‌ল করলি, চারকোণা টেবিল করলি, ফ্‌রিয়ে গেল—কাঠ ঠনিয়ে এত মারপ্যাঁচ কেন রে বাপ্‌!'

'দরকার তো শোবার, বসবার, আর কখনও কদাচ দ্‌'-এক কলম লেখবার। কাজ চলে গেলেই হল।'

'হ্যাঁ, কাজ চলা নিয়ে কথা। কিন্তু এসব কী!' অকস্মাৎ যেন তাঁর পিলে চমকে যায়। 'কাঠগ্‌লোর কী সর্বনাশ করেছে রে গোবরা! ঐ দ্যাখ একটা গোল টেবিল—মোটে তিনখানা পা!'

গোবরা বিরক্তি প্রকাশ করে—'তিন পায়া তো পদে আছে, ঐ কোণেরটা দেখেছ দাদা?'

হর্ষবর্ধন সবিস্ময়ে দেখেন, একটা টেবিলের মোটে একখানা পা—তাও আবার ঠিক মাঝখানে—তারই সাহায্যে বেচারা কোন রকমে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবর্ধন বলে, 'ও টেবিল কোন্ কাজে লাগবে? ওতে কি বসা যাবে?'

হর্ষবর্ধনও সহান্‌ভূতি জানান—হ্‌ঁ, বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

হঠাৎ হর্ষবর্ধনের আকস্মিক উল্লাস হয়—'দেখলি, দেখলি—কেমন পদ্য হয়ে গেল! বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

হর্ষবর্ধন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে পদ্যটাকে আবৃত্তি করেন। গোবর্ধনও করে। তারপর দুই ভায়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

গোবর্ধন বলে, 'আবার মিলেও গেছে কেমন! কোনো খবরকাগজে ছাপতে দিয়ে দাও দাদা। বেশ পদ্য!'

দুই ভাইয়ের মনে বাল্মীকি-সুলভ আনন্দের সূচনা হয়—বাল্মীকির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হবার পরই যে রকম আনন্দ হয়েছিল বলে শোনা গেছে।

তারপর দু'ভাই একটা বড় ঘরে আসে। হর্ষবর্ধন বলেন, 'একটু বসা যাক।'

দুটো চার-পায়া টেবিল—যাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই—পাশাপাশি এখন টানা হয়। একটা হর্ষবর্ধন অধিকার করেন, আর একটায় গোবরা বসে।

'চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসা কি আমাদের পোষায় বাপু? ছড়িয়ে না বসলে বসার আরাম!'

'নিশ্চয়ই তো! এমন আসনে বসতে হবে যে যখন খুশি ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়াও যায়। আসনের সঙ্গে বিলাস-ব্যসন।'

'খাবার দরকারের মত ঘুমোনোর দরকারও তো মানুষের প্রতি মুহূর্তে! গোবরা, ঐ গদি-আঁটা কিম্ভূতকিমাকার চেয়ারদুটো নিয়ে আয় তো! পা রাখার অসুবিধা হচ্ছে।'

পা রাখার সুবিধার জন্যে চেয়ার আসে। দুই ভাই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন। সামনের প্রকাণ্ড আয়নায় হর্ষবর্ধনের প্রতিচ্ছায়া পড়ে—আয়নার ভেতরের আর বাহিরের হর্ষবর্ধনেরা পরস্পরের প্রতি তাকায় আর নিজের নিজের গোঁফে চাড়া দেয়। গোবর্ধন দাদাদের কাণ্ড দেখে।

অদূরদেশ থেকে জুতোর আওয়াজ আসে। হর্ষবর্ধন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেন—'তারাই! বুঝতে পেরেছিস?'

'তালা ভেঙে ঢুকেছে তাহলে! কী হবে এখন?'

হর্ষবর্ধন হাল ছেড়ে দেন—'কী আর হবে! থাকতে দিতে হবে। তোদের কলকাতার যেমন হালচাল তাই তো হবে!'

গোবর্ধন প্রতিবাদ করে—'আমাদের কলকাতা! এমন কথাও বোলো না! আসামের খাসা জঙ্গল থাকতে এমন জায়গায় আবার আসে মানুষ! ছ্যা ছ্যা!' গোরর্ধন যেন প্রায়শ্চিত করতে প্রস্তুত হয়।

গোবরা দরজার ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে দেখে, আগন্তুক মোটে একটি লোক এবং একমাত্র। তার সাহস হয়, হাঁক ছাড়ে—'কে?'

লোকটা চমকে যায়, পালাবে কি দাঁড়াবে ইতস্তত করে—বিড়-বিড় করে কি যে বলে কিছুই বোঝা যায় না।

হর্ষবর্ধন সম্মুখীন হন—'অমন হাঁ করে আমাদের দেখবার কী আছে? ভয় পাবারই বা কী আছে? কলকাতার লোক ভারি অসভ্য বাপু তোমরা!'

ভূত নয় অদ্ভুত-কিছু এইরকম একটা আঁচ করে এতক্ষণে লোকটার ভয় ভাঙে, তার কম্পিত অভ্যন্তর থেকে অস্পষ্ট ধ্বনি বিনির্গত হয়—'কে আপনারা?'

'পরিচয়টা দিয়ে দাও না দাদা!'

'বর্ধন কোম্পানির বড় কর্তা আর ছোট কর্তা। আমি শ্রীহর্ষবর্ধন আর ও গোবরা—।'

'উঁহু, শ্রীযুক্ত গোবর্ধন। এখন বল তো বাপু, তুমি কে? কড়িকাঠ থেকে নেমেছ বলে মনে হচ্ছে যেন! ভূত-পেরেত নও তো?'

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে—'না, আমি কর্মচারী।' আমতা আমতা করে বটে, কিন্তু হাওড়া হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখায় না।

'অ্যাঁ? কর্মচারী!' হর্ষবর্ধন লাফিয়ে ওঠেন, 'বলি বাপু, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল তোমার? শিয়ালদয়ে সকালে যাওয়া হয় নি কেন? মনিব আমি, আর আমার সঙ্গেই মিশতে চাও না এতদূর তোমার আস্পর্ধা—তারপরে তুমি নাকি তবিল মেরে সটকেছ—'

'হুঁ, আমরা যখন শিয়ালদয়ে নামছি তখন হাওড়া দিয়ে সটকানো হয়েছে।' গোবর্ধনেরও রোখ চেপে যায়।—'হাওয়া হয়ে গেছ হাওড়া দিয়ে!'

'যাও, তোমাকে ডিসমিস করলুম!' হর্ষবর্ধন হুকুম পাশ করেন,—'তবিল যা মেরেছ তা মেরেছ, তা আর ফেরত চাই না। টাকা ওড়াবার জন্যেই আমাদের কলকাতায় আসা—ওটা এখানকার বাজে খরচের মধ্যেই ধরে রাখলুম।'

'হ্যাঁ, মেরে থাকো ভালোই করেছ, কিন্তু জবাব হয়ে গেল তোমার। ব্যস, খতম।' গোবর্ধনও রায় দিয়ে দেয়।

এতক্ষণে লোকটা কথা বলবার ফাঁক পায়—'আজ্ঞে আপনারা ভুল করছেন, আমি আপনাদের লোক নই। এই বাড়ির মালিকের কর্মচারী আমি।

হর্ষবর্ধন হতভম্ব হয়ে যান, উনি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো লোক কর্মচারী রাখে—এও কি সম্ভব? কিন্তু ক্রমশ এ কথাটাও তাঁর বিশ্বাস হতে থাকে। তিনি নিজেকে সামলে নেন, কিন্তু গোঁ ছাড়েন না—'তাহলেও

বলি বাপন্, তোমার এ কী রকম আক্কেল! আমরা হলন্ম ভাড়াটে—আর আমাদের তালা বন্ধ করে পালিয়েছ?'

'এটা কি উচিত?' গোবরারও কৈফিয়ৎ তলব।

লোকটা নমস্কার করে—'ও! আপনিই বন্ঝি মিস্টার নন্দী?'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'উঁহন্, নন্দী নই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'ভৃঙ্গীও নই, আমরা হচ্ছি বর্ধন। আসামী, কিন্তু ফৌজদারির আসামী নই। আসামের লোক বলেই আসামী।'

'আসলে বাঙালী।' দাদার অনন্যোগ।

লোকটা বলে—'জমিদার গোঁয়ারগোবিন্দ সিং এ বাড়ি ভাড়া করেছেন—আপনি তাঁরই ম্যানেজার মিষ্টার নন্দী তো?' একটন্ থেমে,—'কিংবা আপনিই বাবন্ গোঁয়ারগোবিন্দ সিং কি না কে জানে!'

'অত শিং নাড়ছ কেন বল তো হে! আসামের হাতির দাঁত ধরে ঝন্লি, শিং দেখে ভয় খাবার ছেলে নই আমরা।' গোবরা দাদার সঙ্গে যোগ দেয়—'তেরোর বারো নম্বরের এই বাড়ি আমাদের ম্যানেজার ভাড়া করে গেছে।'

লোকটা গোবরার মন্তব্যের প্রতিবাদ করে—'তাহলে আপনারা ভুল বাড়িতে এসেছেন মশাই! এ তো ও নম্বর নয়!'

'আলবৎ ওই নম্বর! নিজের চোখে দেখা, বললেই হবে?' হর্ষবর্ধন কন।

'তুমি তো ভারি মিথ্যেবাদী হে!' গোবরা বলে—'তোমার আর দোষ দেব কি, তোমাদের দেশেরই এই স্বভাব। একজন তো চিঠি লিখেছেন যে কলকাতার লোকেরা মিশন্ক নয়। কী রকম যে মিশন্ক নয় তা হাড়ে হাড়ে জেনেছি!'

'তুমি বলছ ভাড়া করি নি, বেশ ভাড়া করছি। তার কী হয়েছে! এখনই করে ফেলছি, এই দণ্ডেই। গোবরা, নোটের তাড়াটা বের কর তো? কত ভাড়া তোমার?'

'কী করে আপনাকে এ বাড়ি দেব মশাই? মিঃ সিং যে বায়না করে গেছেন।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'সিং-এর বয়স কত?'

'মিঃ সিং দাঁড়াশের জমিদার, শন্নেছি খন্ব বন্ড়ো মানন্ষ।'

'ছেলেরাই তো বায়না করে থাকে শন্নে আসছি চিরদিন—কলকাতার বন্ড়ো মানন্ষেরাও আবার,—অ্যাঁ, এ বলে কী রে গোবরা?'

গোবরাও বিস্মিত হয়—'বন্ড়ো মানন্ষের বায়না! আজব শহরে এসে পড়া গেছে দাদা!'

'সে বায়না নয় মশাই, এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন। দুশো বত্রিশ টাকা।'

'বেশ, আমরাও নাহয় দাদন দিচ্ছি। ডবল দাদন। দিয়ে দে তো গোবরা চারশো বাহাত্তর টাকা!'

গোবরা গুণে গুণে নোট দেয়—'গেল এ মাসের দাদন! আবার আসছে মাসে দেব—আবার দাদন...অবশ্য যদি থাকা হয়। মাসকাবারি এসে নিয়ে যেয়ো তোমার দাদন!'

নোটের গাদা দেখে লোকটার মুখ সাদা হয়ে যায়, সহজে কথা বেরোয় না। অনেক কষ্টে বহুক্ষণ পরে বলে 'বেশ, মিঃ সিং-এর জন্যে অন্য বাড়ি দেখতে হবে তাহলে। তিনি আজই দাঁড়াশ থেকে রওনা হবেন কিনা! কাল এখানে এসে পোঁছনোর কথা।'

হর্ষবর্ধন কি যেন চিন্তা করেন—'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বাপু? কিছু মনে কোরো না। তোমাদের এই শহরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা কি রকম? একটা ব্যবস্থা আছেই, নইলে শহরে অ্যাতো লোক! না খেয়ে কেউ বাঁচে না নিশ্চয়ই?'

গোবর্ধন বলে, 'না খেয়ে আবার বাঁচা যায় নাকি! তুমি কী যে বল দাদা! খেতে না পেলে লোকে বাঁচতে চাইবেই বা কেন? খাবার জন্যেই তো বেঁচে থাকা।'

লোকটি জবাব দেয়—'হ্যাঁ, আছে বই কি! ভালো ভালো পাইস হোটেল আছে। সেখানে এক পয়সার ভাত, এক পয়সার ডাল, ঝাল, ঝোল, অম্বল, তরকারি, চচ্চড়ি, শুক্ত, পলতা, মাছের ঘণ্ট, কপির তরকারি—সব পয়সা পয়সা! যা চাই সব এক-এক পয়সায় পাবেন।'

'কলকাতার লোকরা সব সেখানেই গিয়ে খায় বুঝি? বাঃ বেশ তো!'

গোবরা ঘাড় নাড়ে—'অনেক পয়সা খরচ হয় কিন্তু!'

'যার যেমন খুশি', লোকটা ভরসা দিতে চায়—'কেউ ইচ্ছে করলে তিন পয়সার খেয়েও চলে আসতে পারে, কেবল ভাত আর ডাল।'

'কতদূর সেই হোটেল?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন।

'একটু দূর আছে, সেই জগুবাবুর বাজারের কাছটায়।'

'দেখ, আমরা আজ অনেক খেটে-খুটে আসছি দেশ থেকে—গোবরাকে তার ওপরে আবার বাড়িতে চড়তেও হয়েছে। এত চড়াই উৎরাইয়ের পর আমাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। উৎসাহও নেইকো। তুমি যদি বাপু দয়া করে এখানে আমাদের কিনে এনে দিয়ে যাও তাহলে বড়ই বাধিত হই। তোমাকে টাকা দিচ্ছি অবশ্য।'

গোবরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'যত রকম খাবার সব এক-এক পয়সার

এনো—দুশো পাঁচশো যতরকম আছে। সকাল থেকে ভারি খিদেও পেয়েছে দাদা!'

'গোটা পাঁচেক টাকা দিলে কুলোবে? দে তো গোবরা টাকাটা!'

'খুচরা তো নেই দাদা! খুচরো নেই বলেই তো ওকে চারশো বাহাত্তরের জায়গায় চারশো আশি দিতে হয়েছে।'

'তবে তো ঐখানেই আটটা আছে।' হর্ষবর্ধন উল্লসিত হন, 'সত্যি গোবরা, তুই নিজের খেয়ালে কাজ করিস বটে কিন্তু এক-এক সময়ে এমন বাঁচিয়ে দিস যে তোকে কোলাকুলি করতে ইচ্ছে হয়ে যায়!'

কোলাকুলির প্রস্তাবে গোবর্ধন ভীত হয়; এত হাঙ্গামার পর যদি ঐ বিরাট ভুঁড়ির ধাক্কা সামলাতে হয় তাহলেই ও কাবার! তার উপর আবার এই খিদে পেটে!

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে সে—'তাহলে বাপু, একটু চট্ করেই আনো গে। টাকা পাঁচেকের সব পাইস খাবার, আর যে তিন টাকা বাঁচল তুমি নিয়ো। নিজে খেয়ো কিছু। কেমন?'

এ রকম কষ্ট স্বীকারে লোকটার বিশেষ আপত্তি দেখা যায় না। 'বেশ, আপনারা ততক্ষণ নেয়ে-টেয়ে নিন, আমি এসে পড়লুম বলে।'। সে চলে যায়—তার পুলকিত পদধ্বনি হর্ষবর্ধনকে বিস্মিত করে।

'এখানকার লোকগুলো অদ্ভুত, একটুতেই খুশি। যা করতে বলবি তাতেই রাজি হয়ে রয়েছে, পা বাড়িয়ে তৈরী। শুধু একটু হাঁ করার অপেক্ষা!'

'তার উপর ইংরিজি বিদ্যে একফোঁটাও নেই পেটে। নাইস হোটেলকে বলছে পাইস হোটেল! নাইস মানে ফাস্‌কেলাস,—জান তো দাদা?'

'তোর জন্মাবার আগের থেকে জানি!' বলতে বলতে হর্ষবর্ধন টেবিলের উপর লম্বা হন—তাঁর হাই উঠতে থাকে।

চতুর্থ ধাক্কা

সেদিন বিকালের কাহিনী। দুই ভাই গভীর পরামর্শে বসেছেন। আলোচ্য বিষয়, এবার কী করা যায়। নিশ্চয়ই এখনও কলকাতায় আরো অনেক কিছু দেখবার, শোনবার, খাবার এবং চাপবার বস্তু রয়েছে, কিন্তু সে সবের সদ্ব্যবহার করবেন কী করে? জীবনে এই প্রথম তাঁদের কলকাতায় আসা এবং এই হচ্ছে প্রথম দিন। এরই মধ্যে কলকাতার হাল-চাল যা তাঁরা টের পেয়েছেন সেই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই দুই ভাইয়ের আলোচনা চলছিল।

বাস্তবিক, তাঁরা তো নিতান্ত কম কেউকেটা লোক নন! আসামের বিখ্যাত বর্ধন অ্যাণ্ড বর্ধন কোম্পানির বড় দুই অংশীদার। কলকাতায় এসেছেন ফুর্তি করতে—টাকা ওড়াতে। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত জীবনে অনেক টাকা তাঁরা কামিয়েছেন, এবার কিছু কমিয়ে যাবেন, এই ও'দের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এজন্যে কলকাতার যত কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য এবং চাপ্‌তব্য বিষয় আছে সব তাঁরা দেখবেন, শুনবেন, যাবেন এবং চাপবেন—সেজন্যে যত টাকা লাগে দুঃখ নেই। হ্যাঁ, এই হচ্ছে ও'দের স্থির সঙ্কল্প।

কিন্তু টাকা ওড়াবার জো কী! টাকা এমন চীজই নয় যে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে। গোবর্ধন একবার দুশ্চেষ্টা করেছিল দেখতে, টাকা আকাশে ছ'ুড়ে দিলে উড়ে যায় কি না—কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখা গেল তা হাতেই এসে পড়ে, কিংবা হাতের নিতান্ত কাছাকাছি। তা ছাড়া কলকাতার মত জায়গায় টাকা ওড়ানো ভারি কঠিন, হর্ষবর্ধন তাঁর ভাইকে এই কথাই বোঝাতে চাচ্ছিলেন। 'দেখলি না সকালে, আমরা একশ টাকা দিয়ে মোটর ভাড়া করে অমনি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি কিন্তু লোকগুলো গায়ে পড়ে সেধে পয়সা দিতে আসে?'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'হু', টাকা জিনিসটা উপায় করা সহজ, কিন্তু ওড়ানোই দেখছি কঠিন!'

'বিশেষত কলকাতার মত জায়গায়। এখানকার লোকাদের ঠকিয়ে বেশ দু' পয়সা করা যায়। লোকে যে বলে কলকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে—নেহাত মিথ্যে নয়!'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমাদের পয়সারই যে অভাব নেই, এই হচ্ছে দুঃখের বিষয়।'

'হু', হঠাৎ কোন গতিকে গরিব হয়ে যেতে পারলে আবার ব্যবসা ফে'দে এখানে বেশ বড়লোক হওয়া যেত। কিন্তু যা টাকা জমেছে, আর কি গরিব হওয়া সম্ভব?' হর্ষবর্ধন উৎসুকচিত্তে গোবর্ধনকে প্রশ্ন করেন।

ছোট ভাই দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করেছে—'এ জন্মে তো নয়!'

হতাশ হয়ে বড় ভাই চুপ করে থাকেন, খানিক বাদে উত্তেজিত হয়ে উঠেন—'তা'বলে কি এমনি করেই হাত-পা গুটিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকতে হবে? চেষ্টা করতে হবে না? চেষ্টার অসাধ্য কী আছে? দ্যাখ আজ কলকাতায় এসেছি—সারা দিনে আর কতই বা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত! এত কম খরচ হলে চলবে কেন? এইজন্যেই কলকাতায় আসা? নতুন নতুন উপায় করতে হবে না টাকা ওড়াবার? মনিব্যাগটায় দু-পাঁচ শো যা ধরে নিয়ে নে, চল্‌, বেরিয়ে পড়ি। দিনটা কি এমনি এমনি নষ্ট হবে?'

হর্ষবর্ধনবাবু ভ্রাতা এবং মনিব্যাগ সমভিব্যাহারে বেরিয়ে পড়লেন, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে। বাস্তবিক, অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়া গেছে, টাকা খরচ করবার

একটা পন্থা নেই গো! টাকা ওড়াবার নিত্য নতুন ফন্দি বাৎলাতে পারে এমন একজন লোক ভয়ানক বেশি মাইনে দিয়ে রাখতেও তিনি প্রস্তুত,—হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই! এক হাজার—দু'হাজার—যা বেতন চায় নিক না!

রাস্তায় বেরিয়েই দেখলেন, একজন লোক মইয়ে উঠে তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় একটা ছবি সাঁটছে। ছবিটা হনুমানের—না, হনুমানের নয়, দুই ভাই ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন—ছবিটা একটা অতিকায় জাম্বুবানের। বড় বড় অক্ষরে ছবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে—ছবির মাথায়, নিচে জাম্বুবানের বগলের মধ্যে—'কিঙ্‌কঙ্‌'—অত্যন্ত চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর চিত্র, রাওনক্-মহলে।'

'হুঁ, যা বলেছে! এটি যে চমকদার জাম্বুবান সে বিষয়ে ভুল নেই।' গোবর্ধন সায় দেয়—'খুব রোমাঞ্চকরও আবার! কী বল দাদা?'

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'ওহে ব্যক্তি, শোন শোন।' মই আর ময়দার বালতি হাতে লোকটি এগিয়ে আসে। 'বেশ, বেশ ছবিটি তোমার। ভারি খুশি হলাম। একটা আমাদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে লাগিয়ে দাও গে।'

লোকটি জানায় এসব বায়স্কোপের পোস্টার, বাড়ির ভেতরে লাগিয়ে বরবাদ করা তার এক্তিয়ার নেই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে ফিস্-ফিস্ করে বলেন—'না লাগায় নাই লাগাবে। রাত্রে এসে তখন চুপি-চুপি খুলে নিয়ে গেলেই হল—কী বলিস? বেশ ছবিখানা! কত বড় হাঁ করেছে দ্যাখ্! একটা বড় কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে যাব আমরা।'

গোবর্ধন কানে কানে জবাব দেয়—'হ্যাঁ দাদা। আর যদি এখানে বাঁধাতে বেশি খরচ পড়ে, ছবিটার আন্দাজের একটা বড় কাঁচ কিনে নিয়ে গেলেই হবে। দেশে তো আর কাঠের দুঃখ নেই! কারিগরকে দিয়ে ফ্রেম বানাতে কতক্ষণ!'

হর্ষবর্ধন দিল্‌দরিয়া হয়ে ওঠেন—'না, না, এখানেই বাঁধাব। লাগুক না, কত টাকা লাগবে। কোথায় বৈঠকখানা রোড জানি না, কিন্তু খুঁজে নেব ; সেখানে আমাদেরই কাঠের দোকান রয়েছে তো, কত চড়া দামে তারা আমাদের কাঠ আমাদেরকেই বিক্রি করে দেখাই যাক! ম্যানেজারটার কাজের বহর জানা যাবে।' তারপর গোঁফ মুচড়ে নেন—'আরে হাঁদা, আসল কথাটা কী জানিস? তোর বৌদি আসবার সময়ে বলেছিল আমার একটা ফটো তুলিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় ফটো তোলে জানি না তো, এই বিরাট শহরে কোথায় ফটোর কারখানা কে খুঁজে পাবে? তার বদলে যদি এই ছবিখানি বাঁধিয়ে নিয়ে যাই খুশি হবে না কি?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে বিচার করে, একবার দাদার দিকে একবার কিঙ্-কঙের দিকে তাকায়, তুলনা করে দেখে বৌদির চোখে কে অধিকতর পছন্দনীয় হবে, তারপর ঘাড় নেড়ে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানায়।

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'আর একখানা যদি না দিতে পার নাই দেবে। আমরা বাঁধাতাম কিনা! তার দরকারও নেই বড়—গোবরা হতভাগা তো বিয়েই করে নি। কিন্তু কী জান, আমরা বড়লোক কিনা, চিত্রকলার সমঝদার আর পৃষ্ঠপোষক হতে হয় আমাদের। বড়লোক হওয়ার অনেক হ্যাপা, বুঝলে হে? যাক, আমরা দুঃখিত নই সেজন্যে। তা, ছবিখানা আমাদের বাড়ি লাগিয়েছ তার জন্যে কত দিতে হবে তোমাকে? যা চাও বল, লজ্জা কোরো না—কোনো দাম দিতেই কুণ্ঠিত নই আমরা। চাপা গলায় গোবর্ধনের মত নেন—'একশো টাকার একখানা নোট ওকে দিই, কেমন? খুব কম হবে না তো, দ্যাখ্! কলকাতা শহরে এসে মান-মর্যাদা খোয়ানো চলবে না ভাই!'

গোবর্ধন 'সেফসাইডে' থাকে, বলে, 'তাহলে দু-খানাই দাও।'

পোস্টারওয়ালা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল, সে জবাব দেয়—'টাকা নিতে পারব না বাবু, এই হল আমাদের কাজ।'

দুই ভাই যে মর্মাহত হয়েছেন তা মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। লোকটা সান্ত্বনা দিয়ে জানায়—'আচ্ছা, আসছে হপ্তায় আর একখানা ছবি লাগিয়ে যাব, সেটা এর চেয়ে বাচ্চা-গোছের—সান্ অব কঙ্।'

হর্ষবর্ধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে—'বেশ বেশ! কেই ভালো। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা ব্রাদার অব্ কঙ্-ও আনতে পার না? এখনও আমার ছেলেপুলে হয়নি তো, তবে শ্রীমান...' গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে কথাটা তিনি সেরে নিতে চান।

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের দুঃখ সহ্য করতে অপরাগ। তিনি কিঙ্ কঙ্ নিয়ে অম্লান বদনে বাড়ি ফিরবেন রাজার মতই, আর ভাই খালি হাতে বিষণ্ণ বদনে যাবে—এক যাত্রায় পৃথক ফল—এ চিন্তাও তাঁর অসহ্য।

লোকটা বলে—'আচ্ছা, পুছব কর্তাদের। বোধহয় ব্রাদার অব্ কঙ্ও বেরিয়ে থাকবে অ্যাদ্দিনে।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে মানিব্যাগের মুখ বন্ধ করেন—'সেদিন তোমায় টাকা নিতে হবে কিন্তু!'

গোবর্ধনও মনে করিয়ে দেয়—'হ্যাঁ, সেদিন আর "না" বললে শুনছি না!'

দেয়াল-শিল্পী চলে গেলে পরে হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—'ছবিটার মধ্যে ছোট ছোট অক্ষরে কী সব লিখেছে পড়ে দ্যাখ্ তো—ব্যাপারটা কী বলে!'

গোবর্ধন সমস্তটা পড়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে—'ধর্মতলায় রাওনাক্-

মহলে একটা বাইশকোপ হচ্ছে,—সেখানে যেতে ডাকছে সবাইকে।'

'চল্, যাই সেখানে। অমনি নাকি?'

'উঁহু! ঐ যে লিখেছে—"বিলম্বে আসিলে টিকিট পাইবে না!" টিকিট লাগবে।'

'লাগুক না! টাকা খরচ হবে তো! বলছে যখন তখন আর বিলম্ব করে কাজ নেই, চল।'

'হনুমানের ভাই জাম্বুবান—রামায়ণে পড়নি দাদা? তারই সব কীর্তি-কলাপ, বুঝেছ?'

'অনেকক্ষণ। সমস্কৃত ছবি—নাম দেখে বুঝতে পারছিস না? ঐসব অং বং। কিং কং, ততঃ কিং—এসবই হচ্ছে সমস্কৃত।'

গোবর্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'রামায়ণ দেখতে আমার খুব ভালো লাগে দাদা। সেই যে তিন বছর আগে দেখেছিলাম মনে নেই তোমার? কিন্তু এ তো রামযাত্রা নয়, এ হল গিয়ে রামবাইশকোপ! তার চেয়ে ঢের ভালো নিশ্চয়।'

'মনে আছে বইকি। সে ছিল হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড, এ বোধহয় জাম্বুবানের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-টাণ্ড হবে। ধর্মতলাটা কোন্ দিকে রে, জিজ্ঞাস কর্ না কাউকে।'

'জিজ্ঞাসা করে কী হবে, ভাববে পাড়াগেঁয়ে, তার চেয়ে একেবারে মোটরে চেপে বসা যাক।' গোবর্ধনের মোটর চাপবার শখ কম নয়। 'সকালে তো একটা একতালা মোটরে চেপেছিলাম, এবেলা কত দোতালা মোটর ছুটো-ছুটি করছে দেখ না দাদা। ডাকব একটাকে?'

'উঁহু, মোটরে হুস্ করে নিয়ে যায়, শহর দেখা হয় না। যদি কলকাতাই না দেখলাম তো কলকাতায় এসে করলাম কী? এবেলা দোতালা মোটর বেরিয়েছে, কাল সকালে দেখবি তিনতালা, কাল বিকেলে চারতলা—কত কি দেখবি, দু-দিন থাক না, আস্তে আস্তে বেরুবে সব। ভাড়াও হবে তেমনি ডবল, তিনগুণ, চারগুণ—তা চল্লিশ কেন, একশো টাকা হোক না, আমরা বাপু কিছুতেই পিছ-পা নই।'

সগর্বে পদক্ষেপ করতে করতে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হলেন, অগত্যা ব্রাদার অব্ হর্ষবর্ধনকেও মোটর না চাপতে পারার দুঃখ হজম করে দাদার অনুসরণ করতে হল।

চলতে চলতে হর্ষবর্ধনের দৈবাৎ কিসে যেন পা পড়ল, তিনি সহসা পিছলে দুশো হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছলে সাধারণতঃ লোকে পড়েই যায়, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। অকস্মাৎ তীর-বেগে অগ্রসর হবার সময় ধারণা হয়েছিল হয়ত কোন অসম্মাৎ দুর্ঘটনা

ঘটছে, কিন্তু অবশেষে যখন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই রইলেন তখন তাঁর মনে হল, এ তো বেশ মজাই!

নিঃশব্দ-চলমান দাদার সমকক্ষতা বজায় রাখতে গোবর্ধনকে সশব্দে দৌড়তে হল। হর্ষবর্ধন পায়ের তলায় তাকিয়ে দেখেন, এই দুর্নিবার গতিবেগের মূলে সামান্য একটা কলার খোসা। এরই পিঠে চেপে তিনি এক মুহূর্তে এতখানি পথ অনায়াসে উৎরে এসেছেন। কলকাতায় কলার খোসাও একটা চল্‌তি ব্যাপার তাহলে! যানবাহনের একজন। রীতিমতন চাপ্‌তব্যই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে গতিরহস্যটা বুঝিয়ে দেন—ওঃ, এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি, চারিদিকেই কলার খোসা ছড়ানো রয়েছে যে! এগুলো কেন ছড়িয়েছে জানিস? চলবার সুবিধের জন্যে। দেখলি না—না-হেঁটে না-দৌড়ে না লাফিয়ে দুশো হাত এগিয়ে এলাম! এক লহমায় দুশো হাত আনাগোনা কম কথা নয় নেহাত!'

গোবর্ধন মাথা নাড়ে—'যা বলেছ! যারা মটরে যেতে পারে না তাদের জন্যেই রেখেছে বোধহয়। মোটরের মতনই বেগে যায় অথচ ভাড়া নেই এক পয়সাও! কলকাতার হালচালই অদ্ভুত!'

'আমার ভারি চমৎকার লেগেছে। এখন থেকে আমি কলার খোসা চেপেই বেড়াব, কী বলিস! কেন অনর্থক হেঁটে মরি! দেরিও হয় তাতে!'

'না না, পড়ে যেতে পার দৈবাৎ!' গোবর্ধন আপত্তি জানায়।

'পাগল, আমি পড়ি কখনও! কখনও পড়তে দেখেছিস আমায়? কোনও জন্মে?'

'আমি তা'বলে অত দৌড়তে পারব না তোমার সঙ্গে!'

'সেই কথা বল!' হর্ষবর্ধন হাসতে থাকেন।

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে হর্ষবর্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন—'এবার কোন্ দিকে যাবে? চারদিকেই তো রাস্তা!'

গোবর্ধন সংশোধন করে দেয়—'উঁহু, পাঁচদিকে।'

সামনেই একটা কমলালেবুর খোসা পড়ে ছিল, হর্ষবর্ধন সেদিকে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—'এবার একটু রকমফের করা যাক। ঐটায় চেপে যাই খানিক!' বলে যেমন না 'খোসারোহণ' করতে যাবেন, অমনি তিনি চিৎপটাং। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে হর্ষবর্ধন অপ্রতিভ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে থাকেন, যেন পড়েন নি এমনিভাবে পাশের একজনকে প্রশ্ন করেন—'জায়গাটার নাম কী মশাই?'

লোকটা খোট্টা, এক কথায় জবাব দেয়—'ধরম্‌তল্লা—জানতা নেহি?'

'ধড়াম্‌তলা—তাই বল! না পড়ে কি উপায় আছে? ঠিকই হয়েছে তবে।'

গোবর্ধনের কৌতূহল হয়, দাদার সিদ্ধান্তের কারণ জিজ্ঞাসা করে।

'সবাই এখানে ধড়াম্ করে পড়ে যায়। তাই জায়গাটার নাম ধড়াম্‌তলা হয়েছে, বুঝছিস না? পড়তেই হবে যে এখানে!'

'আর কদ্দুর বাপু, তোমার জাম্বুবানের বাইশ্‌কোপ। হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল!' গোবর্ধন বিরক্তি প্রকাশ করে।

হর্ষবর্ধন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়েন—'আবার এদিকে খোসায় চাষাও নিরাপদ নয়কো।'

'এখানে এত ভিড় কিসের দাদা?'

'আরে, এই যে রওনক্-মহল! দেখছিস না লেখাই রয়েছে—ঐ যে সেই ছবিখানা রে! এখানে দেখছি একটা বড় সাইজের রঙচঙে সেঁটেছে!'

গোবর্ধন এবার সাহসী হয়ে একজনকে প্রশ্ন করে বসে—'ওই ঘুল্-ঘুলিটার কাছে এত ভিড় কেন মশাই?'

'এখুনি টিকিট কাটা সুরু হবে কিনা!'—উত্তর দেয় লোকটা।

'ক' টাকার টিকিট কাটবে দাদা?' গোবর্ধন দাদাকে প্রশ্ন করে।

'একেবারে সবচেয়ে সামনের সীট, তা যত টাকাই লাগুক।'

হর্ষবর্ধন বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করেন—'সেবার সনাতনখুড়ো কলকাতা থেকে দেশে ফিরল, তার কাছ থেকে সব আমার জানা। খুড়ো বলে কিনা ঠ্যাটরের সব-আগের সীটের দাম সবচেয়ে বেশি—পাঁচ টাকা করে। "ঠ্যাটর" কী বুঝেছিস?'

'না তো!'

'ঠ্যাটর হচ্ছে থিয়েটার—বুঝলি! খুড়ো কী মুখ্যু দ্যাখ্! তবে, খুড়োরই বা দোষ দেব কী? ইংরিজি উচ্চারণ করা কি সোজা রে দাদা!'

গোবর্ধন আবার সেই লোকটিকে প্রশ্ন করে—'মশাই, সব-সামনের টিকিট কোথায় দিচ্ছে?'

লোকটি এবার বিরক্ত হয়—'দেখছেন না?' ভিড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে—'ঐ তো ফোর্থ ক্লাশের টিকিট ঘর।'

হর্ষবর্ধন দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে নিয়ে ভাইয়ের হাতে মানিব্যাগ দেয়—'ধর্ এটা, টিকিট কেটে আনি গে। থিয়েটারের পাঁচ টাকা হলে বাইশকোপের না-হয় দশ টাকাই হোক! এর বেশি আর কী হবে? ভিড়ের মধ্যে সেঁধুব যে, উপায় কী? সবথেকে দামি সীটের জন্যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হবে জানা কথা।'

গোবর্ধন বলে—'হুঁ! কলকাতার লোকের টাকার অভাব নেইতো!'

নোট দু'খানা দাঁতে চেপে দু' হাতে ভিড় ঠেলে হর্ষবর্ধন ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মুহূর্তপরেই টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি খুলে গেল—খোলামাত্রই তুমুল কাণ্ড! কথা নেই বার্তা নেই, জমাট জনতা সহসা

বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে উঠল—চারিদিকে যেন প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেল! হঠাৎ হর্ষবর্ধন দেখেন তাঁদের উপরে জন-দুই লোক সাঁতার কাটছে এবং তাদেরই একজন, ডুবন্ত লোক যেমন করে কুটোকে আশ্রয় করে তেমনি করে তাঁর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। গতিক সুবিধের নয় দেখে হর্ষবর্ধন নোট দু'খানা মুখের মধ্যে পুরলেন—কি জানি চুল ছেড়ে যদি নোট চেপে ধরে! সেই দারুণ ধস্তাধস্তির মধ্যে হর্ষবর্ধন একবার ডুব-সাঁতার দিতে চেষ্টা করলেন, দু'বার শূন্যে উঠলেন, তিনবার কাৎ হলেন, অবশেষে চারবার ঘুরপাক খেয়ে, নিজের বিনা চেষ্টায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন ; তখন তাঁর খেয়াল হল, নোট দু-খানা গোলমালে গিলে ফেলেছেন কখন।

'দেখেছিস গোবরা, জামার দশা! ফর্দাফাঁই! আরো দু'খানা নোট দে তো—দু'খানা হজম হয়ে গেছে।'

গোবরা পকেটে হাত দিয়ে অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ে, সেখানে ব্যাগের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে না। এই দুর্যোগে বা সুযোগে কে পকেট মেরে সরে পড়েছে। কিন্তু তার বিস্ময় তার বিক্ষোভকে ছাপিয়ে ওঠে—'একি, তোমার কাপড় কী হল দাদা?'

তাই তো! এ কার কাপড় পরে আছেন হর্ষবর্ধন? তাঁর ছিল লাল-পেড়ে ধোপ-দুরস্ত ধুতি—এ কার আধ-ময়লা ফুল-পাড় কাপড়! কখন বদলে গেছে কে জানে!

'আজ আর টিকিট কেটে কাজ নেই দাদা! কাপড় বদলেছে এই যথেষ্ট, এবার যদি চেহারা বদলে যায়?'

ভাবনার কথা বটে! হর্ষবর্ধন বলেন—'তবে চল্ বাড়ি ফিরি। কী আর করব, বেশি খরচ করা গেল না আজ! সারা দিনে আর কটা টাকাই বা ওড়াতে পেরেছি—হজমের এই কুড়ি ধরে?' তাঁর কণ্ঠে দুঃখের সুর বাজে।

গোবর্ধন যেতে যেতে হঠাৎ দেখে, রাস্তার কোণে আর-একটা কার মনিব্যাগ পড়ে আছে, দাদার অলক্ষ্যে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পোরে। ব্যাগটা বেশ ভারি, নোটে-টাকায় নিশ্চয়ই অনেক কিছু। যাক, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে দাদার বকুনি ছিল। মনে মনে সে হিসেব করে, পাঁচশো যদি গিয়েই থাকে তবে সাতশো নির্ঘাত ফিরে এসেছে। টাকা-কড়ি কলকাতার পথে-ঘাটে ছড়ানো থাকে, বলে যে তা মিথ্যে নয়। সত্যিই এসব কথা! গোবর্ধন কলকাতার প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হয়।

বাড়ি ফিরে হর্ষবর্ধন চায়—'দে তো ব্যাগটা!'

প্রসন্ন মুখে গোবর্ধন জবাব দেয়—'সেটা খোয়া গেছে দাদা, তবে আর-একটা কুড়িয়ে পেয়েছি, অনেক টাকা আছে তাতে!...দেখছ কেমন পেট-

মোটা ব্যাগ!...একি! ব্যাগের আবার হাত-পা কেন? কলকাতার হাল-চালই অদ্ভুত! হাত-পা-ওয়ালা মনিব্যাগ! কিন্তু এর মুখ খোলে না কেন! ওমা, এ যে দেখছি মোটর-চাপা-পড়া চ্যাপ্টা কোলা ব্যাঙ!'

হর্ষবর্ধন অট্টহাস্য করতে থাকেন—'যাক, বেশ হয়েছে! পাঁচশো টাকা তবু খরচ করা গেল—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যাবে আজ!'

পঞ্চম ধাক্কা

সেদিন সকাল আটটা বেজে গেল তবু দু' ভাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছিল। অর্ধতন্দ্রায় হর্ষবর্ধন নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখছিলেন, যেমন—কেবলমাত্র কলার খোসায় চেপে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা যায় কি না, কিংবা যদি এমন হত—রেল লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন না চলে যদি প্ল্যাটফর্মটাই চলতে শুরু করত তা হলে কী মজাই না হত যে! কেমন প্ল্যাটফর্মটায় চেপে, খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে খেতে, পায়চারি করতে করতে দিব্যি হিল্লী-দিল্লী বেড়ানো যেত! ঠিক এমনি সুখের সময়ে (মানুষের সুখ বিধাতার সয়না!) সহসা হর্ষবর্ধনের মনে হল, তাঁর ভুঁড়ির ভার যেন অকস্মাৎ অনেকখানি বেড়ে গেছে। চোখ খুললে পাছে স্বপ্নের আমেজ টুটে যায় সেই ভয়ে হর্ষবর্ধন চোখ বুজেই ডাকলেন—'গোবরা এই গোবরা!'

'উঁহু!'

'দ্যাখ্‌তো আমার পেটে কী?'

চোখ না খুলেই গোবর্ধন জবাব দিল—'কী আবার?'

ইতিমধ্যে ভুঁড়ির বোঝাটিকে বেশ সচল এবং সক্রিয় বলে হর্ষবর্ধনের বোধ হতে লাগল। ব্যাপার কি? নিতান্তই কি নিদ্রার মায়া ত্যাগ করে অকালে চোখ খুলতে হবে? কিংবা খবরের কাগজের বড় বড় হরফে যাকে বলে 'ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনা!'—তেমনি ভয়াবহ কিছু তাঁরই উদরের উপরে এই মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে? তাঁর ভয় হচ্ছিল চোখ খুলতে।

'দ্যাখ্‌ না, নড়ছে যে রে—আমার পেটে!'

'পেটে নড়ছে? পিলে-টিলে হয়ত!' গোবর্ধনও চোখ খোলার কষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। হর্ষবর্ধন ভাবলেন গোবরা ভুল বলে নি। পিলেই হবে, নইলে পেটে আবার নড়বেটা কী? আসামের পিলে ডাকসাইটে পিলে, কলকাতায় এসে হাওয়া-বদল করে শহরের হালচাল দেখে আন্দোলন শুরু করেছে—এমন আশ্চর্য কিছু নয়! আকস্মিক ভুঁড়িকম্পের কারণ অবগত হয়ে হর্ষবর্ধন নিশ্চিত হলেন, আবার তাঁর নাক ডাকতে শুরু

করল। ভুঁড়িকম্পে চাপা পড়ার ভয় নেই যখন, সে ভয় বরং পাশের লোকের কিছু পরিমাণে থাকলেও ভুঁড়ির যিনি মালিক তিনি একেবারে অকুতোভয়। সুতরাং হর্ষবর্ধন ভুঁড়তুত বিপর্যয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করলেন। তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

বর্ধনেরা নিশ্চিত হলেও পিলে নিশ্চিন্ত ছিল না ; হঠাৎ গোবর্ধন অনুভব করল কি যেন একটা লাফিয়ে পড়ল তার পেটের উপর। ভয়ে তাঁর সারা শরীর কুঁকড়ে গেল, কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হল না। দাদার পিলে তার পেটে লাফিয়ে আসবে, শারীরতত্ত্বের নিয়মে এটা কি সম্ভব? তিনি ভয়ানকভাবে ভাবতে শুরু করলেন।

ইতিমধ্যে একটা ক্ষীণ আর্তধ্বনি শোনা গেল—মিঁয়াও!

পিলের ডাক! আওয়াজ শুনে গোবর্ধনের নিজের পিলে চমকে গেল ; সে ধড়মড় করে উঠল—'এ যে বেড়াল, ও দাদা!' তার কণ্ঠে ও চোখে বিভীষিকা, বেড়ালকে তার ভারি ভয়। হর্ষবর্ধন উঠে বেড়ালটাকে বিপর্যস্ত গোবর্ধনের উদর থেকে সজোরে বেদখল করে ঘরের কোণে নিক্ষেপ করলেন। 'বেড়াল? বেড়াল এল কোত্থেকে! কী বি—পদ!'

বেড়ালটা তৎক্ষণাৎ ফের লাফিয়ে বিছানায় এসে উঠল—তার সেই লাফটাকে একসঙ্গে হাই এবং লং-জাম্পের রেকর্ড বলা যেতে পারে। মার্জার মহাপ্রভুর ভীত দৃষ্টি অনুসরণ করে দুই ভাই দেখলেন, ঘরের কোণে তিনটে কেঁদো কেঁদো ইঁদুর—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে তাঁদের রাত্রের ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহারে নিরত। বিছানায় বসে তিন জনে সভয়ে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ভয়ের কথাই বটে। কাবুলে ইঁদুর হয় কি না জানা যায় নি, কিন্তু কাবুলি ইঁদুর বলে যদি কিছু থাকে এগুলি হচ্ছে তাই। তারই ভায়রা-ভাই নিঃসন্দেহই। কাবুলি বেড়ালের সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করে কে জানে, কিন্তু গো-বেচারা বাঙালী বেড়ালকে যে এরা আদপেই আমল দেয় না তা তো স্পষ্টই। মানুষদের এরা কদ্দুর খাতির করবে তাও জানা নেই, হর্ষবর্ধন নিতান্ত ভাবিত হন।

গোবরা সাহস দেয়—'ভয় কী দাদা, ওরাও তিনজন, আমরাও তো তিনজন।'

হর্ষবর্ধন হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন—'উঁহু! সম্মুখ-সমরে এই বেড়ালটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় দেখলি না। কী রকম পালাতে ওস্তাদ! কী রকম লাফখানা দিল—বাপ্! আস্ত একটা কাপুরুষ!'

অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়ে কথাটা গোবর্ধনের মনে আসে—'হুঁ, যাকে ইংরিজিতে বলে 'কাউহার্ড' ; আস্ত গোরু! গোরুর পাল। যা বলেছ!'

হর্ষবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন—'যদি এক-একজন করে আসে আমি

ওদের ভয় খাই না। কিন্তু তা তো আসবে না, একসঙ্গে সব তাড়া করবে।'

তাহলে কী বিপজ্জনক ব্যাপারটাই না ঘটবে, ভেবে গোবর্ধন শিউরে ওঠে। একসঙ্গে তিন-তিনটে কাবুলি ইঁদুরের আক্রমণ ঠেকানো কি সহজ কথা? এ যা ইঁদুর, বেড়াল দূরে থাক, এ রকম বাহন দেখলে বাবা গণেশকেও পালাতে হত। কার বাপু প্রাণের মায়া নেই? গোবরা বলে—'বুঝেছ দাদা, এ চীজ দেখলে গণেশ বাবাজীও পালাতেন, এমন কি, তোমার ঐ ঐরাবতও! আমরা তো ছার!'

'হুঁ', হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে ওঠেন—'আমি ভাবছি যদি তাড়া করে তাহলে কী করব। কড়িকাঠ ধরে ঝুলতে হবে দেখছি। পালাব কোথায়?'

'হ্যাঁ, দরজা তো ওরাই আগলে রয়েছে!' দুই ভাই কড়িকাঠ ধরে ঝুলছেন, বেড়ালটা দাদার কাছা আশ্রয় করে দোদুল্যমান, আর নিচে থেকে ইঁদুরদের ভয়ানক লম্ফ-ঝম্প—এই দৃশ্য কল্পনা করে গোবরার হাসি পেল। 'তাই তো, তাহলে তো ভারি মুস্কিল হল দাদা! তুমি কি ওই ভারি দেহ নিয়ে ঝুলতে পারবে?'

বেড়ালটাও কটাক্ষে হর্ষবর্ধনের বিপুল কলেবর লক্ষ্য করল, তার মুখ-ভাব দেখে মনে হল গোবর্ধনের মতন সেও এবিষয়ে সন্দেহবাদী। বেড়ালের সহানুভূতি হর্ষবর্ধনের হৃদয় স্পর্শ করল।

'যদি করেই তাড়া আমি ভয় করি নাকি?' হর্ষবর্ধন তাল ঠুকে বেড়ালটার লেজ মুঠিয়ে ধরেন—'তাহলে এই বেড়ালটাকেই বাগিয়ে ধরব! বেড়ালে ইঁদুর মারে বলে শুনেছি—এই বেড়াল-পেটা করেই ইঁদুর ব্যাটাদের মেরে খতম্ করব।'

বেড়ালটা হস্তগত লেজের বিরুদ্ধে কুণ্ঠিতভাবে আপত্তি জানায়—'মিউ।'

অনাহূত ও অনাকাঙ্ক্ষিত এই চতুষ্পদ ব্যক্তিটিকে গোবরাও ক্রমশ ভাল লাগছিল। ভাল লাগবারই কথা, আসন্ন বিপদের মুখে শত্রুর সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়। ভীষণ বন্যাবর্তে মানুষ আর বাঘ একই ঘরের চাল আশ্রয় করে পাশাপাশি ভেসে চলেছে অনেক সময়ে এমন দেখা গেছে (দেখার চেয়ে শোনা যাওয়াই সম্ভব, কেননা সেই দারুণ স্রোতের মাথায় দাঁড়িয়ে দেখার লোক তখন কোথায়?)। যাই হোক, আসল কথা এই, বিপদে পড়লে বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, সুতরাং একটা বেড়ালের সঙ্গে গোবরা ভাব করে ফেলবে এ আর বেশি কথা কী?

সুতরাং সে দাদার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে—'তাহলে বেড়ালটাও যে সাবাড় হবে!'

'হয়, হোক গে। কথায় বলে, যাক শত্রু পরে পরে। ইঁদুরও যাক, বেড়ালও যাক—ওদের কাউকেই চাই নে।'

'আচ্ছা, ইঁদুরগুলো যদি এখন বিছানায় লাফিয়ে আসে দাদা?'

'কেন, তা আসবে কেন? বিছানা কি ওদের খাদ্য নাকি?'

'হ্যাঁ, গদি কাটে বলে শুনেছি। নিশ্চয় তুলো খায়। কিন্তু তা নয়, যদি বেড়ালটাকে তাড়া করে আসে?'

'অ্যা, বলিস কী?' হর্ষবর্ধন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, 'তা পারে তাড়া করতে—যে-রকম মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বেড়ালটার দিকে! কী হবে তাহলে?' হর্ষবর্ধনের হৃৎকম্প হয়।

'দে, ওকে ইঁদুরদের দিয়ে দে—পিকনিক করে ফেলুক। ওর জন্যে কি আমরাও প্রাণে মরব?'

কিন্তু বেড়ালটা বোধ করি ওদের মৎলব টের পেয়েছিল, এমন ভাবে গদিতে নখ এঁটে বসল যে টেনে তোলে কার সাধ্য! বেড়ালের সঙ্গে টাগ্ অব্ ওয়ারের প্রাণান্ত পরিশ্রমে দুই ভাই যখন ঘর্মাক্ত-কলেবর, ইঁদুর তিনটে তখন প্রাতরাশ সমাপ্ত করে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছে। বাহুযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিন জনের কেউই এদিকে দৃক্‌পাত করেন নি। প্রথম বেড়ালের নজরে পড়তেই সে ঘাড় ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতক্ষণ পরে পরিষ্কার গলায় উঁচু খাদের ডাক ছাড়ল—'ম্যাঁও!'

পরমুহূর্তেই সে বর্ধনদের বাহুপাশ থেকে নির্মুক্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে গেল, দরজা পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ইঁদুরদের উচ্ছিষ্টে মনোনিবেশ করল।

বেড়ালের স্বরের তারতম্য থেকেই হর্ষবর্ধন ঘরের পরিবর্তন আবিষ্কার করতে পারলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন,—'বাঁচা গেল, বাপ্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার! ইঁদুরে বেড়াল তাড়ায়—কলকাতার হাল-চালই অদ্ভুত!'

'শহুরে ইঁদুর দাদা! যে রকম ভাবভঙ্গী দেখলাম, মানুষেরই তোয়াক্কা করে না, তো বেড়াল। আমার তো বুক কাঁপছিল এতক্ষণ!'

'কিন্তু'—খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটে।

'হুঁ।' গোবর্ধন কি যেন ভাবতে থাকে।

'তুই কী ভাবছিলি?'

'ভাবছিলাম বেড়ালটা যে শহুরে ইঁদুর দেখে ঘাবড়েছিল তা হয়ত নয়।'

'তা নয় তো আবার কী! আমাদের কর্মচারী কী লিখেছিল? কলকাতার হালচালই এই। মেশামেশির তত বেশী পক্ষপাতী নয় এরা। এমনকি এই বেড়ালেরাও।'

'উঁহু, তা নয়; পিলেগের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি, কী তাতে?'

'শহর-জায়গায় ভারি হয়।' গোবর্ধনের চালটা মুরুব্বিয়ানা হয়ে ওঠে —'ব্যায়রামটার নাম পিলেগ কেন জান? পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে—তাই পিলেগ। লেগ কাকে বলে জান তো?'

হর্ষবর্ধন দাবড়ি দেন—'যা-যাঃ, তোকে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না! তোর মাথা!'

'উহু, লেগ মানে মাথা নয়, ঠিক তার উল্টো। যাকে বলে গিয়ে পা।'

'জানি জানি, তোকে আর বলতে হবে না! ফীট মানেও পা হয়— আবার ফীট দিয়ে আমরা কাঠ মাপি, সে হল গিয়ে আর-এক ফীট।'

'আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেও ফীট হয়, সে আবার আরেকটা ফীট। কিন্তু তাতে গিয়ে তোমার লেগ হয় না—লেগে আর ফীটে এইখানেই তফাৎ।'

হর্ষবর্ধন চটে যান—'বুঝেছি রে বুঝেছি। এখন পিলেগের কথা ক'।'

'শহরের ইঁদুর, বুঝেছ, কামড়ালেই পিলেগ। বেড়ালটা কেন ঘাবড়াচ্ছিল, বুঝলে এখন? ইঁদুরের ভয়ে নয়, পিলেগের ভয়ে।'

'অ্যাঁ, বলিস কীরে?' হর্ষবর্ধন এবারে চমকে ওঠেন সত্যিই!

'শহুরে বেড়াল, কত ডাক্তারের বাড়ি ওর যাতায়াত—কত ডাক্তারি কথা-বার্তা শোনে, রোগ-ব্যায়রামের ব্যাপার সব ওর জানা, তাই ও সাবধান, বুঝেছ দাদা, সাবধানের বিনাশ নেই বলে কিনা!'

'তুই ঠিক বলেছিস।' হর্ষবর্ধন সোজা হয়ে বসেন। 'আজ কিংবা কালই এ বাড়ি আমাদের ছাড়তে হবে। যা ইঁদুরের উপদ্রব এখানে— কখন যে কামড়ে দেয় কে জানে! কামড়ে দিলেই হল!'

'ব্যস, তাহলেই পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত—'

'—আগাগোড়া পিলেগ!' হর্ষবর্ধন বাক্যটা সম্পূর্ণ ক'রে মুখখানা প্যাঁচার মত বানিয়ে তোলেন। গোবর্ধনও দাদার মুখের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে বসে।

ষষ্ঠ ধাক্কা

বসে থাকতে থাকতে দুই ভাই অকস্মাৎ উৎকর্ণ হন, তাঁদেরই বাড়ির সদর দুয়ারে খঞ্জনী বাজিয়ে কে সঙ্কীর্তন শুরু করেছে।

হর্ষবর্ধন অভিভূত হয়ে বললেন, 'আহা, কে এমন হরিগুণ গান করে! গোবরা, ডেকে আন উপরে, কোন মহাপুরুষ-টহাপুরুষ হবে! দর্শন করা যাক।'

নিচে থেকে গোবরার গলা শোনা যায়—'কোন মহাপুরুষ নয় দাদা, একেবারেই টহাপুরুষ।'

'তুই ডেকে নিয়ে আয়।'

খঞ্জনীধারীকে নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢোকে। একজন খোঁড়া ভিখারী—সিঁড়ি ভেঙে উপরে আসতে অনেক কষ্ট, অনেক কসরৎ করতে হয়েছে তাকে। খোঁড়া দেখে হর্ষবর্ধনের দয়া হয়, তিনি সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পান—'ভগবান তোমাকে খোঁড়া করেছেন সে জন্যে দুঃখ ক'রো না ভাই, এ তাঁর দয়া। এ জন্মে আমাদের মত পাপী-তাপীকে হরিনাম শুনিয়ে পুণ্য অর্জন করছ, পরজন্মে তাঁর দয়ায়—'

গোবরা কথাটা পূরণ করে—'তুমি একজন সেরা ফুটবল-প্লেয়ার হবে।'

ভিখারীর মুখ বিকৃত হয়—'আর যা বলেন বাবু, তেনার দয়ার কথা বলবেন নি, দয়ার জন্যেই মরে আছি! ভয় হয়, এ জন্মের ক্ষেতি সারতে পরজন্মে না চার-পেয়ে করে পাঠান আমায়!'

লোকটার বিধাতার কৃপায় অরুচি দেখে হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন—"তুমি বোধহয় পদ্যপাঠ পড় নি, সেই পদ্যটা—'একদা ছিল না জুতা চরণ-যুগলে, একদা ছিল না জুতা'—তার পরে কী ছিলরে গোবরা?'

গোবরার ধারণা হয়, দাদা ওকে ধাঁধা পূরণ করতে বলছেন ; তাই অনেক ভেবে সে লাইনটা মিলিয়ে দেয়—'মোজা পরে চলিয়া গেলাম কর্মস্থলে।'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন—'উঁহুহুঁ! মনে আসছে না পদ্যটা—সেই কবে বাল্যকালে পড়েছি। যাই হোক, তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, একজন লোকের একদিন পায়ে জুতো ছিল না বলে সে সেই রাগে ভগবানকে গাল পাড়ছিল, হঠাৎ দেখল আর-একজনের পা-ই নেই ; তার তো কেবল জুতোই নেইকো আর একজনের জুতো থাকার প্রয়োজনই নেই! তাই দেখে তখন তার দুঃখ দূর হ'ল।'

গোবরা যোগ করে—'আর যে লোকটার পা ছিল না সে-ও অন্য লোকটার জুতো নেই দেখে অনেকটা আরাম পেল। দু'জনেই ভগবানের অপার মহিমা স্মরণ ক'রে মনে মনে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।'

ভিখারীটা এই উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা কতটা হৃদয়ঙ্গম করল সে-ই জানে, কিন্তু সে-ও জোরের সঙ্গে সায় দিল—'দেবেই তো!'

তাঁর শিক্ষার ফল ধরছে দেখে হর্ষবর্ধন পুলকিত হন—'দ্যাখো! তবেই বোঝ। খোঁড়া হওয়া খুবই দুঃখের তাতে ভুল নেই, কিন্তু কানা হ'লে আরও কত কষ্ট! ভগবান যে তোমাকে—'

ভিখারী বাধা দেয়—'যা বলেছেন বাবু, আগে যখন কানা ছিলাম তখন লোকে কেবল আমাকে অচল পয়সা চালাত। সিসের সিকি দুয়ানি

যতো! বাধ্য হয়ে আমায় খোঁড়া হতে হ'ল—কী করি? লোকে ভারি ঠকায়।'

হর্ষবর্ধন দারুণ বিস্মিত হন—'বল কী? তুমি কি আগে অন্ধ ছিলে নাকি?'

'তা, চোখ পেলে কী করে?' গোবরাও বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করে।

ভিখারী আমতা আমতা করতে থাকে—'ভগবানের কেরপা! তা ছাড়া আর কী বলব মশাই!'

'তাই বল!' গোবরা আশ্বস্ত হয়। হর্ষবর্ধন বলেন—'সেই কথাই তো বলছিলাম হে! ভগবানের দয়ায় কী না হয়?'

ভিখারী তাগাদা লাগায়—'পয়সা দিন বাবু, যাই এবার। অনেক বাড়ি ঘুরতে হবে আমাকে, বেলা হ'ল।'

'আমাদের কাছে তো পয়সা নেই বাপু, নোট আছে কেবল। গোবরা—' বলা-মাত্র গোবর্ধন একখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে আনে।

ভিখারী তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়—'ওঃ দশ টাকার নোট! তা আপনারা দু'জনে দুটো পয়সা দেবেন তো বাবু? আমি ন' টাকা সাড়ে পনের আনা ফেরৎ দিচ্ছি—' বলে ঝুলি ঝেড়ে রাশীকৃত পয়সা বের করে গুণতে শুরু করে সে।

'উঁহুঁহুঁ—' হর্ষবর্ধন বাধা দেন—'তুমি গোটা নোটখানাই নাও। ওর বদল দিতে হবে না; আমরা খরচ করতেই শহরে এসেছি।'

ভিখারীর চোখদুটো ডাগর হ'য়ে ওঠে, সে অবাক হ'য়ে যায়; কিছুক্ষণ পরে সন্দেহের দৃষ্টিতে নোটখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে, আসল কি নকল আবিষ্কারের চেষ্টা করে। জাল নোটের ভ্যাজাল নয়তো? দেখে টেখে শেষে তার সাহস হয়—'বাবু, আপনি কি পুলিসের টিকটিকি?"

হর্ষবর্ধন স্তম্ভিত হন—'গোবরা, এ বলে কীরে? আমি টিকটিকি! কলকাতায় এসে কি টিকটিকির মত চেহারা হল নাকি আমার? আয়নাখানা আন্‌তো দেখি একবার!'

গোবরা আয়না আনতে পাশের ঘরে দৌড়োয়। বাবুর ভাবান্তর দেখে, পাছে নোটখানা কেড়ে নেয় সেই ভয়ে ভিখারীও সেই অবসরে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

হর্ষবর্ধন আপন মনে বলতে থাকেন—'বৌ বলছিলে বটে, যেয়ো না বাপু কলকাতায়, চামচিকের মতন চেহারা হবে। কিন্তু চামচিকে না হয়ে হয়ে গেলাম টিকটিকি! আশ্চর্য!'

আয়না দেখে হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে—'নাঃ, এখনও অদ্দুর গড়াইনি।' গোবর্ধন দাদাকে ভরসা দেয়, দাদার মুখে আবার হাসি খেলে—

যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভিখারীটা! লোকটা কানা ছিল কি, এখনও সেই কানাই রয়েছে!'

গোবর্ধনও সে বিষয়ে দ্বিমত নয়—'হ্যাঁ, এখনও চোখ সারেনি সম্পূর্ণ। তা নইলে তোমার মতন ইয়া লম্বা-চওড়া ভুঁড়িদার লোকটাকে বলে কিনা টিকটিকি! ছ্যাঃ!' ভিখারীর উপর সমস্ত শ্রদ্ধা তার লোপ পায়।

'কিন্তু দেখেছিস, ভিখিরি হলে কী হবে, লোকটার অগাধ পয়সা! সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার চেঞ্জ বার করে দিচ্ছিল! কলকাতার ভিখিরিরাও কী বড়মানুষ! আসামের অনেক ধনীকেই হয়ত কিনতে পারে।'

'যা বলেছ দাদা, হাতে-হাতে ন' টাকা সাড়ে পনের আনা নগদ—চাই-কি নিরেনব্বই টাকা সাড়ে পনের আনাও বের করতে পারত হয়ত!'

'তাহলে একখানা একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে নিলি নে কেন? খুচরো টাকা-কড়ির কখন কি দরকার পড়ে বলা যায় না তো!'

'আর কী দেখলাম জান দাদা? আরো অদ্ভুত ব্যাপার!'

'কী—কী?' হর্ষবর্ধন উৎসুক হন।

'লোকটা আসবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, কতো কষ্টে সৃষ্টে এল যে! কিন্তু যাবার সময় সিঁড়ি টপকে তর-তর করে নেমে গেল। ভারি আশ্চর্য কিন্তু!'

হর্ষবর্ধন বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না—'আশ্চর্য আর কি, এ কি আমাদের আসাম? এ হল গিয়ে শহর কলকাতা। এখানকার হালচালই আলাদা।'

তিনি আয়নার মধ্যে আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।

সপ্তম ধাক্কা

সাজ-সজ্জা ক'রে দুই ভাই নগর-ভ্রমণের জন্যে বার হন। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গোবর্ধন হতাশ হয়ে ওঠে—'কই দাদা, তুমি যে বলেছিলে আজ সকালে তিনতালা মোটর বেরুবে?' কই এখনও বেরুলো না তো!'

'বেরুবে বই কি, সবুর কর! না বেরিয়ে যাবে কোথায়? বেরুতেই হবে! তিনতালাও বেরুবে, চারতালাও বেরুবে—তবে, পাঁচতালার কথা ঠিক বলতে পারি না।'

'পাঁচতালা মোটর বোধ হয় নেই।'

'কলকাতায় কী আছে আর কী নেই কিছুই বলা যায় না। সনাতন-খুড়ো এই কথা বলে, বুঝলি?'

'ধুত্তোর তোমার সনাতনখুড়ো!'

'আরে, এত অধীর হচ্ছিস কেন? যদি তিনতালা মোটর এ বেলা না-ই বেরোয়, দোতালার ছাদে দাঁড়িয়ে যাব না-হয়—সেও তো তিনতালাই হবে।'

'পড়ে যাই যদি?'

'ধুর, পড়বো কেন? আমি কখনও পড়ি? তবে ধড়াম্‌তলার কাছটায় একটু সাবধান হতে হবে, জায়গাটা বড় খারাপ। আর পড়বই বা কেন? মাথার ওপর দিয়ে বরাবর তার চলে গেছে দেখছিস না?'

'দেখছি তো!'

'কেন বল্‌ দেখি? ধরবার জন্যে। পড়বার মুখেই তার ধরে ফেলবি, ব্যস।'

সত্যিই তো, যতদূর দৃষ্টি যায়—গোবর্ধন চোখ চালিয়ে দেখে—রাস্তার মাঝখান দিয়ে বরাবর তারের লাইন চলে গেছে আর তারই তলা দিয়ে অতিকায় মোটরগুলো হুলুস্থুল হয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে। সে মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ করতে থাকে, যথার্থই তার মত দাদা দুনিয়ায় দুর্লভ। 'তবে চল দাদা, চটপট একটা মোটরের ছাদে উঠে পড়া যাক। ছাদে যাবার সিঁড়িও আছে যেন দেখা যাচ্ছে। থামাব একটাকে?'

'একটু দাঁড়া।' পাশের দোকানের দিকে হর্ষবর্ধনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়—'দোকানটা এ-রকম দাঁত বের করে রয়েছে কেন দেখা যাক তো!'

উভয়ে দাঁত-বের-করা দোকানের দিকে অগ্রসর হন। 'বাবা, দাঁতের কী বাহার! দেখলে পিলে চমকায়! এটা কিসের দোকান হ্যা?'

একজন সাহেবি-পোশাক-পরা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হর্ষবর্ধনের কথার জবাব দেন—'আমরা দাঁত তুলি, দাঁত বাঁধাই। আমি ডেন্টিস্ট।'

'গোবরা তোর পোকা-খাওয়া দাঁতটা তোলাবি?'

'তা তোলালে হয়, পোকারা খেয়ে শেষ করতে কদ্দিন লাগাবে কে জানে? ওদের ওপর তো বরাত দিয়ে বসে থাকা যায় না।'

'হ্যাঁ তুলেই ফ্যাল্‌। পরের ওপর নির্ভর করা ভাল নয়। তা, কতক্ষণ লাগবে একটা দাঁত তুলতে?'

ডেন্টিস্ট বলেন—'কতক্ষণ আর? এক মিনিট; আপনি টেরটিও পাবেন না।'

'কত মজুরি?'

'মজুরি কী মশাই, ফিস বলুন!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক কথাই—চেঁচিয়েই বলি আর ফিস-ফিস করেই বলি। দিতে হবে কত?'

'দশ টাকা আমাদের চার্জ।'

'বলেন কী মশাই! এক মিনিটের কাজের জন্যে দ—শ টাকা! আপনি

কি ডাকাত? চলে আয় গোবরা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে পেয়ে ভদ্রলোক ঠকাচ্ছেন, চলে আয়, তোর দাঁত তুলিয়ে কাজ নেই।'

গোবরাও অবাক হয়—'সত্যিই তো! মিনিটে মিনিটে দশ-দশ টাকা রোজকার, তাও আবার পরের দাঁত তুলে! শহুরে ঠক দাদা, পালাই চল এখান থেকে! আধ ঘণ্টা কাঠ চিরলে একখানা তক্তা হয়, তার দাম আট আনাও নয়; আর এদিকে এক মিনিটে দশ টাকা—তাও আবার গোটা দাঁত না, আধখানা।'

হর্ষবর্ধন আরো রুষ্ট হন—'আমরা বেড়াতে এসেছি, খরচ করতেই এসেছি তাতে ভুল নেই, কিন্তু ঠকতে রাজি নই আমরা। হ্যাঁ, যদি ন্যায্য হয় দুশো টাকা নাও, দিচ্ছি, কিন্তু ঠকিয়ে কেউ একটি পয়সাও নিতে পারবে না আমাদের, হুঁ!'

মেজাজ আর ধরন-ধারনেই দাঁতের ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন যে খদ্দের কেবল দাঁতালোই নয়, শাঁসালোও বটে। এমন মক্কেল হাত-ছাড়া করা ঠিক না; তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদি একটা দাঁতের জন্যে দশ টাকা খরচ করতে নারাজ হয়, না-হয় দশটা দাঁতই তুলিয়ে নিক। তাঁর আপত্তি নেই, কেননা তাঁর পক্ষে তো দশ মিনিটের মামলা! তাহ'লেই তো আর ওদের ঠকা হবে না।

নিতান্তই চলে যায় দেখে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন—'দশ টাকায় একটা দাঁত তোলানো যদি লোকসান জ্ঞান করেন, না-হয় দু'জনের দুটো দাঁত তুলে দিচ্ছি ঐ এক চার্জে।'

হর্ষবর্ধনকে দলের পাণ্ডা বিবেচনা ক'রে ডেন্টিস্ট তাঁকেই হাত করার তাল করলেন—'দেখুন, বাজার মন্দা, কম্পিটিশন খুব কীন, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রেট তো কমাতে পারি নে! বরং আপনার একটা দাঁত না-হয় অমনি তুলে দিতে রাজি আছি। এর চেয়ে আর কী কনসেশন আশা করেন বলুন?'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'একেবারে অমনি?'

'একেবারে।'

'পোকায় না খেলেও?'

'ক্ষতি কী?'

হর্ষবর্ধন কিন্তু আপ্যায়িত হন না। 'মশাই, আমরা কলকাতায় এসেছি, টাকা খরচ করব এ কথাও সত্যি; কিন্তু তাই বলে যে অনর্থক দাঁত খরচ ক'রে যাব এ দুরাশা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। অমনি হলেও না।'

গোবরা বলে—'হ্যাঁ, টাকা আমাদের অঢেল হতে পারে, কিন্তু দাঁত আমাদের মুষ্টিমেয়। বাজে খরচ করবার মত দাঁত নেই আমাদের।

হর্ষবর্ধন উষ্ণ হয়ে ওঠেন—'আমাদের পাড়াগেঁয়ে দেখে আপনি হয়ত ভেবেছেন যে একটা দাঁও। কিন্তু ভুল ধারণা মশাই আপনার, যত বোকা আমাদের দেখায় তত বোকা আমরা নই! আমরাও ব্যবসা করি—কিন্তু দাঁতের নয়, কাঠের।'

গোবরা সানাইয়ের পোঁ ধরে—'হ্যাঁ, ব্যবসা করেই খাই আমরা, কাঠের ওপর করাত করাত চালাই, তা ঠিক, কিন্তু গলায় কারো ছুরি বসাই না।'

এতক্ষণে ডেন্টিস্ট কথা বলার ফুরসৎ পান—'আমিও না। ছুরি নয়—সাঁড়াশি বসানোই আমার কাজ, তাও গলায় নয়, দাঁতে।' তিনি গোবর্ধনকে সংশোধন করে দেন।

হর্ষবর্ধন চটে যান—'তা, সাঁড়াশিই বসান আর খুন্তিই বসান কিংবা হাতাই বসান, এক মিনিটের কাজের মজুরি যে দশ টাকা দিয়ে ফেলব, এত ছেলেমানুষ পান নি আমাদের।'

গোবরা দাদার কথায় সায় দেয়—'আর হাতুড়িই বসান চাই কি!'

ডেন্টিস্ট যেন এতক্ষণে আলো দেখতে পান—'ও, এই কথা! এক মিনিটের কাজে দশ টাকা দিতে আপনাদের আপত্তি? তা, না-হয় এক ঘণ্টা ধরে আস্তে আস্তে দাঁতটা তুলে দিচ্ছি—তাহলে তো হবে?' তাঁর প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

এবার হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন : 'হ্যাঁ, তাহলে আপত্তি নেই। উচিত খাটুনির উচিত দাম নেবেন, এতে নারাজ হবে কে? কী বলিস তুই গোবরা?'

গোবরাও উৎসাহিত হয়—'দু-ঘণ্টা ধরে তুলুন—কুড়ি টাকা নিন—উচিত মজুরি দিতে আমরা পেছোব না। কিন্তু এক মিনিটে—জানতেও পেলাম না, বুঝতেও পেলাম না—সে কী কথা!'

ডেন্টিস্ট গোবরাকে নির্দেশ করেন—'নিন, বসে পড়ুন তো ঐ চেয়ারটায়! আপনাদের অভিরুচিটা স্পষ্ট করে বললেই পারতেন গোড়ায়, এত বকাবকি হত না! দেখে নেবেন আপনি, এমনভাবে এত আস্তে একটু একটু করে তুলব যে আপনি তো টের পাবেনই, পাড়াশুদ্ধ সবাই টের পাবে যে হ্যাঁ, একটা দাঁত তুলছে বটে।'

গোবর্ধনের ভারি আনন্দ হয়—'হুঁ, পোকারাও যেন টের পায়! ভারি বজ্জাত ব্যাটারা ; এমন যন্ত্রণা দেয় মাঝে মাঝে!' তাকে জিঘাংসাপরায়ণ দেখা যায়।

হর্ষবর্ধনের হাসি ধরে না—'এই তো চাই! দাঁত তোলা হবে, কাক-চিল জানতে পারে না—কে কী কথা! পাড়াশুদ্ধ জানুক যে হ্যাঁ, একটা মানুষের মত মানুষের দাঁতের মত দাঁত তোলা হচ্ছে! নইলে দাঁত তুলে লাভ কী? কথায় বলে, হাতিকা বাৎ, মরদকা দাঁত।'

ডেন্টিস্ট বাধা দেন—'উঁহু, ভুল হল কথাটা। মরদকা বাৎ হাতিকা—'

হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন—'দুইই হয়। হাতিকা বাৎ তো শোনেন নি! কী করে শুনবেন, থাকেন কলকাতায়! আমরা আসামের জঙ্গলে থাকি, আমরা জানি। দিনরাত শুনতে পাই।'

ডেন্টিস্টের চোখ কপালে ওঠে—'কেন, সেখানে কি হাতির দাঁত হয় না?'

'হয় না তা কি বলেছি?' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন, 'কথাটার মানে হল এই যে হাতির আওয়াজ যেমন জোরালো তেমনি জোর হবে পুরুষের দাঁতের। যাকে কামড়াবে তার আর রক্ষা নেই। সেই যে শক্ত ব্যামো—জল দেখলে ঘাবড়ায়—তাতেই খতম হবে নির্ঘাৎ! কী ব্যামো রে গোবরা?'

গোবরা মাথা চুলকোতে থাকে—'কি হাইডো না ফাইডো—'

'হ্যাঁ, ফাইড্রো-হোবিয়া। ইংরিজি কথা মনে রাখা কি সোজা রে দাদা!' হর্ষবর্ধন আরো বিশদ করে দেন, 'বুঝলেন মশাই, দাঁতই হ'ল গে মানুষের প্রধান অস্ত্র। প্রথমে দাঁত, তার পরেই হাত।'

গোবরা নিজের গবেষণা যোগ করে—'ও দুটো কাজে না লাগলে তারপরেই পা—পালাবার জন্যে।'

বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার জন্যে হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উপর উত্তপ্ত হন—'কিন্তু তাই ব'লে পা কিছু অস্ত্র নয় তোমার। বরং বাহন বলতে পার, পায়ে চেপেই তো আমাদের যাতায়াত।'

পাছে দু' ভাই দোকানের মধ্যেই নিজেদের অস্ত্রবলের পরিচয় দিতে শুরু করে দেয় কিংবা বাহন বলে বেগে বেরিয়ে যায় সেই ভয়ে ডেন্টিস্ট তাঁর মক্কেলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন—'বসে পড়ুন চেয়ারটায়। আবার তো অনেকক্ষণ লাগবে দাঁতটা তুলতে!'

গোবরা বলে—'এখন কী করে হবে? এখন তো একঘণ্টা ছেড়ে এক মিনিট সময় নেই আমাদের। শহর দেখতে বেরুচ্ছি এখন, সন্ধ্যার পরে আসব। কী বল দাদা!'

'সেই ভাল। এর মধ্যে তুই বরং কাবুলি ইঁদুরের গর্তটা খুঁজে রাখিস। দাঁতটা সেই গর্তে দিলে কাবুলি দাঁত পাবি।'

'কী হবে দিয়ে? আর কি দাঁত উঠবে আমার? এ তো দুধে-দাঁত নয়!' গোবরা সন্দেহ প্রকাশ করে।

'এ জন্মে না ওঠে পরজন্মে তো উঠবে? আরে, কর্মফল তোর যাবে কোথায়!'

'তাহ'লে তো কাবুলি হয়ে জন্মাতে হয় দাদা!'

'যদি হয় তো হবে। তোর বুলি শুনিয়ে লোককে কাবু করে দিবি—মন্দ কী!'

ভবিষ্যতের কল্পনায় গোবর্ধন মুহ্যমান হয় কি না হয় ঠিক বোঝা যায় না।

ভাইকে করতলগত করে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হন। 'আচ্ছা, আসি তাহলে ডেন্টিস্ট মশায়। কী দাঁত-ভাঙা নাম মশায় আপনার! কোনো সাহেবে রেখেছিল বুঝি? যেন ইংরিজি ইংরিজি মনে হচ্ছে!'

'হুঁ, যা বলেছ দাদা! ডেনটিশ মেনটিশ কখনও বাঙালীর নাম হয়? পারবেন মশাই, পারবেন—আপনিই পারবেন দাঁত তুলতে। আপনাকে উচ্চারণ করতেই দাঁত উঠে আসে—সাঁড়াশির দরকার হয় না! ডেনটিশ—বাব্বাঃ! কী নাম!'

অতিথিরা অন্তর্হিত হলে ডেন্টিস্ট দু-বার কাঁধের ঝাঁকি দেন—'কোথাকার আমদানি কে জানে! বাহনের সাহায্য যখন নিয়েছে, আর ফিরবে বলে বোধ হয় না। না ফিরুক, যা চমৎকার আইডিয়া একখানা দিয়ে গেছে তারই দাম দশ টাকা!'

এক ঘণ্টা পরে তাঁর দরজার ওপরে নতুন একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা যায়ঃ

'দাঁতই হল মানুষের প্রধান অস্ত্র।
নিরস্ত্র লোককে সশস্ত্র করাই আমাদের কাজ।
আমরা দাঁত বাঁধাই।'

ততক্ষণে দুভাই তিনতালা মোটরের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে উঠেছেন। অবশেষে হর্ষবর্ধন হতাশ হয়ে পড়েন—'নাঃ, কোনো আশা নেই! বেশিতালার মোটর সব ভাড়া হয়ে গেছে আজ। তার চেয়ে এক কাজ করি, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা যাক। সেটাও তো একটা চাপবার জিনিস!'

গোবরার মোটরে চাপা শখ, সে তেমন উৎসাহ পায় না—'দূর! ঘোড়ার গাড়িতে আবার মানুষ চাপে!

হর্ষবর্ধন উত্তেজিত হন—'কেন চাপবে না? ঘোড়ার চাপে, তো ঘোড়ার গাড়ি। তোর যে কেন এত মোটরের ঝোঁক—আমি বুঝি না! আমার তো নিত্যি নতুন জিনিস চাপতে ইচ্ছে করে। ঘোড়ার গাড়ি কি গাড়ি নয়? আমি ডাকছি ঐ গাড়িটাকে—এই কচুয়ান, কচুয়ান!'

ক্যোচমান গাড়ি এনে খাড়া করে। 'কোথায় যেতে হবে বাবু?'

গোবর্ধন অসন্তোষ প্রকাশ করে—'গাড়ি তো নয়, চার চাকার পিঁজরে!'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে ক্যোচম্যানের কেশবিন্যাস দেখে আত্মহারা—'বাঃ, তোমার খাসা চুল তো হে! কোন্ নাপিতের কাছে ছেঁটেছ?'

'নাপিত নয় বাবু, সেলুনের ছাঁট।'

'চালই তো কলে ছাঁটে জানি, আজকাল চুলও কলে ছাঁটছে? কালে কালে হল কী! তা, কোথায় কিনতে মেলে এই সব সেলুন-কল? একটা দেশে নিয়ে যাব তাহলে।'

'কোন কল না বাবু, সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।'

'দোকানে চুল ছেঁটে দেয়? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! তা বাপু, তুমি সেই দোকানে নিয়ে চল না আমাদের। আমরা তোমার মত করে চুল ছাঁটব। ভাড়া বল, বকশিস বল, দশ টাকা দেব তোমাকে। দে তো গোবরা, একখানা নোট ওকে! নাও, আগাম নাও।' গাড়িতে চেপে হর্ষবর্ধনের স্ফূর্তি হয়, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলাম বলেই তো চুল ছাঁটার দোকান জানলাম! কখন কিসে কার থেকে কী উপকার হয় কেউ কইতে পারে? কলকাতার মত চুল ছাঁটলে পাড়াগেঁয়ে বলে কারু সন্দেহও হবে না, কেউ আমাদের ঠকাতেও সাহস করবে না।'

গোবর্ধন গুম্ হয়ে থাকে।

'তা ছাড়া কলকাতায় এলাম, তার একটা চিহ্ন তো নিয়ে যেতে হবে, আমাদের মাথা দেখে তবু এখানকার হালচালের কিছু পরিচয় পাবে দেশের লোক। তারা কত অবাক হবে ভাব তো!'

তবুও গোবর্ধন সাড়া দেয় না।

'তাই মাথায় করে নিয়ে যাব কলকাতাকে। সারা কলকাতা তো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি না, তাই মাথাটা কলকাতার মত করে নিয়ে যাই।'

গোবর্ধন এবার জবাব দেয়—'কে যেন গোটা গন্ধমাদনই মাথায় করে নিয়ে গেছল না?'

হর্ষবর্ধন কি-একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু বাধা পড়ে ; ক্যোচম্যান গাড়ির দরজা খুলে ডাকে—'নামুন বাবু, এসে পড়েছি।'

হর্ষবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে—'সে কি! এক মিনিটও তোমার গাড়ি চাপলাম না এর মধ্যেই এসে পড়লাম!'

গোবর্ধন বলে, 'কড়কড়ে দশটা টাকা গুণে দিয়েছি নগদ!'

ক্যোচম্যান জবাব দেয়—'যেখানে যেতে বললেন নিয়ে এলাম। বিশ্বাস না হয়, ঐ দেখুন দোকানের সাইনবোর্ড।'

দুই ভাই গাড়ির দুই জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান—সত্যিই, অবিশ্বাসের কোণো কারণ নেই, 'সাইনবোর্ডে' স্পষ্ট করে বড় বড় হরফে লেখা—

"এখানে উত্তমরূপে চুল ছাঁটা আর দাড়ি কামানো হয়।"

হর্ষবর্ধন তবু ইতস্তত করেন—'এত শিগগির এলে! তোমার গাড়ি

যে বাপু মোটরের চেয়েও জোর চলে দেখছি! গাড়ি চাপলাম, তা টেরই পেলাম না!'

গোবরাও নামতে রাজি হয় না—'তোমার কি বাপু পক্ষীরাজ ঘোড়া? একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল!'

ক্যোচম্যান বলে—তা যখন দশ টাকা পেয়েছি হুকুম করেন তো আপনাদের আলিপুর ঘুরিয়ে আবার এখানেই নিয়ে আসছি। কিন্তু আলিপুর গেলে একটু মুস্কিল আছে।'

'কী? কী মুস্কিল? কিসের মুস্কিল?' দুই ভাইয়ের যুগপৎ জিজ্ঞাসা।

'সেখান থেকে আপনাদের ফিরতে দিলে হয়!' ক্যোচম্যান একটু মুচকি হাসে।

গোবরা বলে—'কেন? কেন ফিরতে দেবে না? কে ফিরতে দেবে না? আটকাবে কেটা? কার অ্যাদ্দুর ক্ষমতা? আমরা পালিয়ে আসতে জানি।'

হর্ষবর্ধন অধিকতর সমীচীন হন—'উঁহু, দরকার নেই গিয়ে! জায়গাটা বোধহয় খারাপ, প্রাণের ভয়-টয় আছে। নইলে বারণ করবে কেন? নেবে পড়্ গোবরা!' তিনি ভুঁড়িকে অগ্রবর্তী করেন, গোবরা পশ্চাদ্বর্তী হয়।

গাড়ি চলে গেলে গোবরা আকাশ থেকে পড়ে—'আরে, এ যে আমাদের সামনের বাড়ি গো! কাল থেকে দুশো বার এ সেলুনটা আমার চোখে পড়েছে। কেবল ভাবছি, নীল কাচের দরজা দেওয়া ঘরটা কী হতে পারে! তখন তো জানি নি এই-ই সেলুন!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন, 'বলিস কী!' তিনি ঘুরে দাঁড়ান। 'তাই তো! ঐ যে ও ফুটপথে আমাদের বাড়ি! আর তার পাশেই সেই ডেন্টিস্টের দোকান!'

এমন সময়ে একটি বছর পনেরর ফুটফুটে ছেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে। গোবর্ধন তাকে চিনতে পারে—'তোমাকে যেন দেখেছি হে! তুমি আমাদের পাশের বাড়ির না?'

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করে—'কোন্ বাড়িটা আপনাদের?'

'ঐ যে আমার ছবি সাঁটা রয়েছে—দেয়ালে—' ভুল ধরতে পেরে হর্ষবর্ধন তৎক্ষণাৎ শুধরে নেন—'উঁহু, আমার নয়, কিং কঙের ছবি সাঁটা রয়েছে ঐ আমাদের দেয়ালে—'

'দেখেছি। আর ঐ বাড়িটা আমাদের।' ছেলেটা দাঁত-বের-করা দোকানটা নির্দেশ করে, 'ডেন্টিস্ট আমার বাবা।'

'অ্যাঁ, বল কী গো? দেখি, হাঁ কর তো! একি, তোমার সবগুলো দাঁতই যে ঠিকঠাক রয়েছে! এটাও তোলেন নি তো!' হর্ষবর্ধন চমৎকৃত হন।

গোবর্ধন বলে—'তোমার বাবা বোধহয় তোমাকে তেমন ভালবাসেন না?'

'তোমার দাঁতগুলো সব বাঁধানো বোধহয়?' হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ হন।

ছেলেটা ঘোরতর প্রতিবাদ করে—'বাঃ, তা কেন হবে? কখনই নয়!'

গোবরার কৌতূহল হয়—'টেনে দেখতে দেবে?'

'এই যে আমি নিজেই টানছি, দেখুন না!' ছেলেটি প্রাণপণ বলে দু'-হাতে দু'পাটি আকর্ষণ করে।

তথাপি হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থেকে যায়—'উহু, তুমি জান না যে তোমার দাঁত বাঁধানো। দু'পাটিই তোলা হয়েছে, তোমার মনে নেই। তুমি ডেন্টিস্টের ছেলে, তোমার কখনও আসল দাঁত হয় নাকি?'

গোবরা বলে—'সেলুনে বুঝি চুল ছাঁটতে গেছলে?'

'না, দাড়ি কামাতে গেছলাম।'

'এইটুকুন ছেলে, তোমার দাড়ি কই হে!' বিস্ময়ে হর্ষবর্ধন বিরাট হাঁ করেন।

দাড়িহীনতার লজ্জায় ছেলেটি মিয়মান হয়ে যায়—'দাড়ি আর টাকা কি অমনি আসে মশাই? কামাতে হয়। আমার কথা নয়, মাস্টারমশাই বলেন। আমার ইস্কুলের টাইম হল।'

ছেলেটি চলে যায়, দুই ভাই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন। অবশেষে গোবর্ধন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে—'কী রকম বুঝছো দাদা এই কলকাতার হালচাল?'

হর্ষবর্ধন মাথা চুলকোতে থাকেন—'তাই তো দেখছি!'

'এ বাড়ির লোকের দাড়ি না-গজাতেই সামনের বাড়ির লোক সেলুন খুলে বসে গেছে। আজব শহর দাদা, কী বল!'

হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—'চল, সেলুনে ঢুকি!'

অষ্টম ধাক্কা

কাল থেকে গোবর্ধন নীল কাচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হতে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—সেই নীল কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোনদিন তার জীবনে হবে, এ প্রত্যাশা তার ছিল না। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানা সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে যেতে-আসতে সে দেখেছে আর ভেবেছে, বিশ্বশুদ্ধ লোকই কি ঐ বাড়ির বাসিন্দা নাকি! কিন্তু এখন কেবল আর এক মুহূর্তের ব্যবধান—একটু পরেই ঐ রহস্যালোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে। ডিটেকটিভ বইয়ের

শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপতে থাকে, গোবর্ধনের এখন সেই দশা।

যবনিকা অপসৃত হলে দেখা যায়, ছোট্ট একটি ঘর মাত্র। তার ভেতরেই কায়দা করে খান-ছয়েক চেয়ার সাজানো—ছ-টা বিরাট আয়নার মুখোমুখি; সবকটা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির বেজায় জোর খচ-খচ! হর্ষবর্ধন ভাবেন কী আশ্চর্য, এইটুকুন ঘরে বিশ্ব-ভারতের আমন্ত্রণ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুরই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে—সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা! কামিয়ে দিয়ে বেশ কামিয়ে নিচ্ছে। বাহাদুর বটে! গোবর্ধন কী ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধকরি সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

যাওয়া-মাত্রই কর্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে, দু'জনকে দুটো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, একজোড়ামাথা ও গালের দিকে দৃষ্টিআকর্ষণ ক'রে সবিনয়ে জানায় যে ওই দুটির 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হতে যা দেরি! আর, তার পরেই তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভে হর্ষবর্ধন খুশি হ'য়ে ওঠেন। গোবর্ধনও রীতিমত বিস্মিত হয়। নীল কাচের নেপথ্য-লোকের যিনি একচ্ছত্র মালিক তাঁর পর্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, শহরের হলেও এবং হাতে ধারালো ক্ষুর থাকলেও এমনি লোকের কাছেই গাল ও গলা (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন-কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও তেমন শক্ত ব্যাপার নয়।

গোবর্ধন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। সত্যিই, রহস্যলোকই বটে! ওধারের আয়নার ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কী আশ্চর্য! একই আয়নার মধ্যে গোবর্ধন দেখছে, একশোটা ঘর, একশোটা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে হয়ে যেন দিগন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্ধন ভাবছে, এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এমনি এক কুড়ি বড় বড় আয়না বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। প্রত্যেক ঘরে দুটো করে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাতে ঘরের সংখ্যা বাড়বে, আত্মপ্রসাদও বাড়বে সেইসঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ করে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়িতে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন এখন কেবল আর-একটি গোবর্ধনকে মাত্র দেখতে পায়, কিন্তু এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে এক-সঙ্গে দেখতে পাওয়া যাবে—গোবর্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা দুই নিয়ে যুগপৎ! কী মজাই না হবে তাহলে।

যাদের চুল-দাড়ির গতি হচ্ছিল, হর্ষবর্ধন বসে বসে তাদের ভাবগতিক দেখছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস্‌-ফিস্‌ করতে বাধ্য হন—'গোবরা

দেখেছিস, লোকগুলোর মুখের ভাব খুব হাসি-হাসি নয় কিন্তু!'

'চুল-ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার দাদা!'

'জানি, গুরুতর ব্যাপার ; কিন্তু তাই বলে এতখানি গোমড়া মুখ করতে হবে এ-ই বা কী কথা?'

তবে তিনি এটাও ভাবেন, এক চুল ইদিক উদিক হলে কত মানুষের মন মেজাজ বিগড়ে যায়, এখানে এখন কতো চুল এদিক ওদিক হয়ে যাচ্ছে—সেদিকটাও তো ভেবে দেখবার।

আর, তা ভাবতে গেলে হাসি পাবার কথা কি?

গোবরা অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে—'হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে মনে হয়!'

হর্ষবর্ধন সায় দেন—'যা বলেছিস! হাল আর মাথা দুই-ই হল এক জিনিস, দুটোরই কর্ণ আছে কিনা! শুদ্ধ ভাষায় মাঝিকে বলে কর্ণধার-- জানিস নে?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'নাপিতকেও বলা যায় ও-কথা! কর্ণধার তো বটেই, তা ছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও বেশ ধার।'

একটা আয়নার চেয়ার খালি হয়, হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোবরা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—'দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে, আমার পরে হবে।'

হর্ষবর্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোন কাজে তাঁর মন সরে না। একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটরে চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা একসঙ্গে আস্বাদ করছেন, অথচ চুল-ছাঁটার আনন্দ একা তাঁকেই প্রথম উপভোগ করতে হবে! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয় ; 'বেশ, তুই না-হয় আগে দাঁত তোলাস।' তারপর কি ভাবেন খানিকক্ষণ—'আমি না-হয় দাঁত তোলাবই না।' হ্যাঁ, গোবরার দাদু-ভক্তির বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে তিনি কঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। ভাইয়ের জন্যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার ক'রে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোবরা দাদুভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে?

চেয়ারে বসে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল ছাঁটার কথা শুনলেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে চীনেম্যানরাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্ধনের ধারণা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

হ্যাঁ, দাড়ি কামানোর সময়ে হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে, এর চেয়ে চীন দেশে জন্মানো ভাল ছিল। আসামের গাছ-পালা রেহাই পেত, তিনিও রেহাই পেতেন। দেশি নাপিতকে যদি বলেছেন,—'দাড়িটা আর একটু

ভিজিয়ে নাও হে—বড্‌ডো লাগছে', অমনি তার জবাব পেয়েছেন, 'দরকার হবে না বাবু, আপনার নয়নজলেই সেরে নিতি পারব।' বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের দাড়ির উপর অশ্রুবর্ষণ করতে হয়েছে। যদি বলেছেন, 'তোমার ক্ষুরটা ভারি ভোঁতা বাপু!' অমনি বাপুর উত্তর—'ডবল খাটুনি হল তার দ্বিগুণ মজুরি দিন তাহলে।' সুতরাং আর-এক দফা অশ্রুবর্ষণ। আর চুল ছাঁটার কথা না তোলাই ভাল। উবু হয়ে বসে খবরের কাগজের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে কী কর্মভোগ! চুলের সঙ্গে কাঁচির সে কী ঘোরতর সংগ্রাম—আবার অনেক সময়ে ঠিক চুলের সঙ্গেই না, মাথার খুলি, কানের ডগা, খোদ হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও। কাঁচির খোঁচা খেয়ে হর্ষবর্ধন ক্ষেপে ওঠেন; ইচ্ছা হয় নাপিতকে মনের সাথে দু'ঘা দেন কষিয়ে—কিন্তু দারুণ বাসনা তিনি দমন করে নেন। নাপিতকে মারা আর আত্মহত্যা করা এক কথা, কেননা এমন সুযোগ প্রায়ই আসে যখন নাপিতের ক্ষুর আর গলার দূরত্ব খুব বেশি থাকে না। অনেক ভেবে হর্ষবর্ধন নাপিতকে মার্জনা করে ফেলেন। বিবেচক হর্ষবর্ধন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে পরিত্রাণ পেলেও চুল নিয়ে কি পরিত্রাণ আছে সেসব-নাপিতের কাছে? অনেক ধস্তাধস্তি করে মাথায়-মাথায় হয়ত রক্ষা পান, কিন্তু চুলের অবস্থা দেখে হর্ষবর্ধনের কান্না পায়—আয়নায় যেটুকু স্বচক্ষে দেখা যায় সে তো শোকাবহ বটেই, আর যে অংশ 'পরস্ব' চোখে জানতে হয় তার রিপোর্টও কম মর্মভেদী হয় না। এধারে খপচানো, ওধারে খপচানো, কাকে-ঠোকরানো, বকে-ঠোকরানো—যত দিন না চুল বেড়ে আবার ছাঁটবার মতন হয়েছে তত দিন সে মাথা মানুষের কাছে দেখালে মাথা কাটা যায়। এই হেতু কাঁচি-হাতে নাপিতের আবির্ভাব দেখলেই হর্ষবর্ধনের জ্বর আসে, মাথা ধরে, ঘাম হয়, পেট কামড়াতে থাকে—এমন কি বমি করে বসেন! ঠিক যে-সব উপসর্গ ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাবার আগে অনিবার্যরূপে দেখা দিত।

কিন্তু সে চুল-ছাঁটার সঙ্গে এ চুল-ছাঁটার তুলনাই হয় না। এ কেমন চেয়ারে বসে সাদা চাদর জড়িয়ে (যাতে একটিমাত্র পলাতক চুলও তোমার কাপড়-জামার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে না পারে) দস্তুরমত আরাম! ঘণ্টাখানেক চোখ বুজে ঘুমিয়েও নিতে পার, জেগে দেখবে তোফা চুল ছেঁটে দিয়েছে—ঠিক কচুয়ানদের মতই। তুমি কচুয়ান নও বলে যে তোমাকে কম খাতির করবে তা নয়—কোনরকম উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই এ সব শহুরে নাপিতের কাছে। যে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় না তাকেও এরা মানুষ বলেই গণ্য করে। কেন, হর্ষবর্ধনকে কি এরা কম খাতির করেছে? ঢোকবামাত্রই কত সাদর সম্ভাষণ—ডেকে চেয়ারে বসানো—সম্বর্ধনা কি

কিছু কম করেছে এরা? তবু তো হর্ষবর্ধন কচুয়ান নন। হর্ষবর্ধন গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে, আরামে গা এলিয়ে দেন। মাথার উপরে হু-হু করে পাখা ঘুরছে—সম্মুখে নিজের চেহারা দেখবার সুবর্ণ সুযোগ—হর্ষবর্ধন স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। মুখখানা হাসি হাসি করে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করেন তিনি। নাপিত একটা নতুন ধরনের কাঁচি হাতে নেয়, কাঁচির কলেবর দেখে হর্ষবর্ধন অবাক হন। কাঁচি না বলে তাকে চিরুনিও বলা যায়, তার মুখের দিকে চিরুনির মত দাঁত আর হাতলের দিকটা অবিকল কাঁচি! হর্ষবর্ধন বস্তুটির মনে মনে নামকরণ করেন—'কাঁচিরুনি'। নাপিতকে প্রশ্ন করেন—'অদ্ভুত কাঁচি তো!'

'কাঁচি নয়, ক্লিপ।' নাপিত উত্তর দেয়। 'পেছনটা ক্লিপছাঁটা হবে তো?'

'যেমন কলকাতার দস্তুর তাই কর।'

ঘাড়ের পেছনে ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন শিউরে শিউরে ওঠেন। যন্ত্রটা তেমন আরামপ্রদ নয়। যেন ঘাড়ের চামড়া একেবারে চেঁছেপুছে নেয়, চুলগুলোকে যেন গোড়া থেকে সমূলে উপড়ে তোলে। কখনও ঘাড় কোঁচকান, কখনও টান করেন, কখনও কাত করেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সুবিধা করতে পারেন না। অবশেষে মরীয়া হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন,—'থামাও তোমার কিলিপ! ঘাড় গেল আমার! এ যে দেখছি আসামী কাঁচির বাবা!'

নাপিত ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়, কোন উচ্চবাচ্য না করেই। তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। পাড়াগেঁয়ে যারা প্রথম চুল ছাঁটায় তারা সবাই এইরকমই করে কিন্তু পরে আবার তারাই চেহারার খোলতাই দেখে খুশি হয়ে আশাতীত বখশিস দিয়ে ফেলে। ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন একবার কাতর নেত্রে গোবর্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কী করবেন, ভাগ্যের কবল থেকে কারু কি নিষ্কৃতি আছে! তিনি অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করেন। গোবরা তাকিয়ে দেখে, দাদার হাসি-হাসি মুখভাব বেশ কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসেছে এখন। নাপিতের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নীল দরজা ভেদ করে সবেগে প্রস্থান করবে কি না সে ভাবতে থাকে। আপন মনে গজরায়,—'আসলে হল খুরপি, নাম দিয়েছেন কিলিপ! তা, খুরপি চালাবে তো বাগানে চালাও গে না! পরের ছেলের মাথায় কেন বাপু?'

পেছন শেষ করে সামনে ছাঁটাই শুরু হয়, কিলিপের স্থান অধিকার করে কাঁচি। সামনের চুল যেমন তেমনই থাকে, কেবল ডগাগুলো সামান্য ছেঁটে সমান করে দেওয়া। কাজ সমাধা হয়েছে জানিয়ে, পছন্দ হয়েছে কি না নাপিত প্রশ্ন করে। হর্ষবর্ধন সেই প্রশ্ন গোবর্ধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

গোবর্ধন প্রাণপণে পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু চুল-ছাঁটাটা কোন্ জায়গায়

হল খ‌ুঁজে পায় না। সামনের চুল তো ছোঁয়াই হয় নি, আর পেছনটা দিয়েছে খ‌ুরপি দিয়ে একদম ন্যাড়া করে। সমান করে আঁচড়ালে সামনে দাড়ি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে—নাক-ম‌ুখই দেখতে পাওয়া যাবে না, আর পেছনে তো মাথার খ‌ুলিই বেরিয়ে পড়েছে, খোলাখ‌ুলি সেই সাদা চামড়া ঢাকতে পরচুলোই পরতে হয় কি না কে জানে! গোবরা স্বাধীন অভিমত দেয়,—'সামনে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ।'

'হ‌ুঁ, সামনেটা একট‌ু কমানো দরকার।' হর্ষবর্ধন মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর আশঙ্কা হয়, কমাতে বললে হয়ত কাঁচি ছেড়ে কিলিপ দিয়ে কামাতে শ‌ুর‌ু করে দেবে। ভয়াবহ যন্ত্রটার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ করে তিনি বলেন,—'না, থাক।'

'তাহলে হেয়ার ড্রেস করি?' নাপিত হর্ষবর্ধনের অন‌ুমতির অপেক্ষা রাখে। হর্ষবর্ধন মনে মনে আলোচনা করেন, হেয়ার মানে তো চুল, অবশ্য খরগোসও হয় কিন্তু এখানে চুলই হবে, কিন্তু ড্রেস করবে—সে আবার কী! চুলে কাপড় পরাবে নাকি? তিনি ভয়ে ভয়ে জিগেস করেন,— 'কিলিপের ব্যাপার স্যাপার নয় তো?'

'না না, মাথায় গোলাপ-জল দিয়ে—'

'তা দাও, তা দাও।' ঘাড়ের পেছনটা তখন থেকে ভারি জ‌্বলছিল, জল পড়লে হয়ত ঠাণ্ডা হতে পারে ভেবে হর্ষবর্ধন উৎসাহিত হন, বলেন, 'আচ্ছা, চুল না ছাঁটলে ব‌ুঝি তোমরা গোলাপ-জল খরচ কর না—না?' নাপিত ঘাড় নাড়ে। 'কর? বটে? আহা, তা জানলে আমি ড্রেস হেয়ারই করাতাম, তাহলে চুল ছাঁটতে আগাতো কোন্ হতভাগা!'

নাপিত গোলাপ-জল দিয়ে চুলগ‌ুলো ভিজিয়ে দেয়, দিয়ে চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙ‌ুল চালায়। হর্ষবর্ধনের আরাম লাগে, ঘ‌ুম পায়। কিন্তু ক্রমশই নাপিতের 'ড্রেস হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে, তার আঙ‌ুল-গ‌ুলো হয়ে ওঠে যেন লোহঘটিত—সে তার সমস্ত বাহ‌ুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্ধনের খ‌ুলির ওপর। হর্ষবর্ধন লাফাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না, লাফাবেন কী করে? পায়ের জোরে মান‌ুষ লাফায় বটে, কিন্তু লাফাতে হলে পা ও মাথা একসঙ্গে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর শ্রীচরণ স্বাধীন থাকলে কী হবে, মাথা যে নিতান্তই বে-হাত! মাথা বাদ দিয়ে লাফানো যায় না। হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করেন,—'এ কী হচ্ছে? এ কী হচ্ছে? এ কী রকম তোমাদের ড্রেস-হেয়ার? এ তো ভাল নয়!'

খোট্টারা যেমন প্রবল পরাক্রমে বর্তন মলে, গোবর্ধন দেখে, সেই তালে দাদার ড্রেস হেয়ার চলছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে,—'এ কি বেওয়ারিশ মাথা পেয়েছ যে চটকে-মটকে দিচ্ছ?'

নাপিত এ সব কথায় কান দেয় না, তার কাজ করে যায়। সে কখনও

রগ্‌ টিপে ধরে, কখনও মাথায় থাবড়া মারে, কখনও সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধরে গোড়া ধরে টানে, কখনও দু'ধার থেকে টিপে মাথাটাকে চ্যাপ্টা করার চেষ্টা পায়, কখনও ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতলগত। হর্ষবর্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে, তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়,—'গোবরা, তোর বৌদিকে বলিস আমি সজ্ঞানে কলকাতা-লাভ করেছি!' এর বেশি আর তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু গোবরা বুঝতে পারে দাদার অবস্থা সংকটাপন্ন, দাদাকে সজ্ঞানে আসাম-লাভ করাতে হলে এই মুহূর্তেই এখান থেকে সটকান দিতে হবে। সে যেন ক্ষেপে যায়—'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি আমার দাদাকে ; নইলে ভাল হবে না!'

নাপিত হতভম্ব হয়ে হস্তচালনা থামায়।

'এমনিভাবে মাথাটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, এর মানে কী?'

'চুলের গোড়া শক্ত হয় এতে।'

'চুলই রইল না তো চুলের গোড়া! টেনে টেনে তো আর্ধেক চুল ওপড়ালে, মাথায় চুল কোথায় আর?'

'এ রকম করলে মাথা ছেড়ে যায়।'

'মাথা ছেড়ে যায়?' গোবরা যেমন অবাক হয়, তেমনি চটে। 'ছেড়ে যায়? ছেড়ে গেলে তুমি জোড়া দিতে পারবে?'

নাপিত কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গোবরা কণ্ঠে আরো জোর খাটায়,—'যে মাথা তুমি দিতে পার না সে মাথা নেবার তোমার কী অধিকার?'

হর্ষবর্ধন ঘেরাটোপের ভিতর দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে ক্লিপটা হাতাবার চেষ্টা করেন,—'গোবরা, সহজে না ছাড়ে যদি তাহ'লে দে এই যন্তরটা ওর ঘাড়ে বসিয়ে! মজাটা টের পাক।...মাথা ছাড়িয়ে দেবেন—ভারি আবদার আমার!'

গোবরা বলে,—'না, দরকার নেই ঝগড়াঝাটির। এই নাও তোমার মজুরি দশ টাকা। দেশে চুল ছাঁটতে দশ পয়সা—কলকাতায় না-হয় দশ টাকাই হবে, এর বেশি তো না? দাদা, আর দেরি ক'রো না, উঠে এস! চল পালাই! পালিয়ে যাই এখেন থেকে এক দৌড়ে।'

দুই ভাই নাপিতকে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না, চক্ষের পলকে সেলুন পরিত্যাগ করে।

বাইরে এসে হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। হতাশভাবে মাথায় হাত বুলোন,—'সত্যিই তো, টাক ফেলে দিয়েছে দেখছি! যাক, খুব রক্ষা পাওয়া গেছে! একেবারে মাথায় মাথায়! আরেকটু হলে মাথাটাই ফেলে আসতে হত!'

গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে,—'এরা পেছনের চুল দেয় দাড়ি কামানো করে আর সামনের চুলগুলো দেয় উপড়ে—একেই কি বলে চুলছাঁটা? আজব সহরের অদ্ভুত হালচাল!...অ্যাঁ, এত লোক জমছে কেন চারদিকে?'

দুই ভাইকে কেন্দ্র করে ক্রমশই জনতা ভারি হতে থাকে। হর্ষবর্ধন ফিস-ফিস করে বলেন,—'দু'জনের দু'রকম চুল দেখে অবাক হচ্ছে বোধহয়?'

'উঁহু,' গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে জানায়, তোমার বোরখাটা খুলে ফেল নি এতক্ষণেও?'

পালাবার মুখে ঘেরাটোপ ফেলে আসার অবকাশ সামান্যই ছিল, কিন্তু সেটাকে তখন পর্যন্ত গায়ে জড়িয়েই রেখেছেন হর্ষবর্ধন। এতক্ষণে খেয়াল হল। সত্যিই, লোকে যা বলে মিথ্যা নয়, অদ্ভুত কলকাতার হালচাল! ঘেরাটোপ খুলে ফেলতেই জনতা আপনা থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কোন উচ্চবাচ্য করল না।

চাদরটা গুটিয়ে বগলে চেপে হর্ষবর্ধন বলেন,—'এই দ্যাখ্!' তাঁর হাতে সেই ভয়াবহ ক্লিপটা। 'আমি ইচ্ছে করে আনি নি, পালাবার সময় আমার হাতে ছিল। কী করব? ফেরত দিয়ে আসি?'

'আর যায় ওখানে?' গোবরা ভয় দেখায়—'আবার যদি শুরু করে দেয়?'

'তবে থাক এটা। দেশে গিয়ে দীনু নাপিতকে দেখাব। এবার যে ব্যাটা আমার চুল ছাঁটতে আসবে দেব এটা তার ঘাড়ে বসিয়ে—তা কলকাতার নাপিতই কি আর আসামের নাপিতই কি!'

'বেশ করেছ এটা নিয়ে এসে। কলকাতার বহুৎ লোক তোমাকে চার পা তুলে আশীর্বাদ করবে। অনেকের ঘাড় বাঁচিয়ে দিলে!'

হর্ষবর্ধন মাথা নাড়েন,—'যা বলেছিস তুই! একখানা মানুষমারা কল! ক্লিপটা দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নেন তিনি। 'যাক, ঘামাচি মারা যাবে এটা দিয়ে।'

'বৌদি কাক তাড়াবে এই দেখিয়ে। কাকের উৎপাত থেকে বাঁচা যাবে তাহ'লে। মানুষ এ দেখলে ভয় খায় আর কাক খাবে না? কী বল দাদা?'

'তখন থেকে ঘাড়টা কী জ্বলছে যে! মাথাটাও টাটিয়ে উঠেছে! চুল নিয়ে কি কম টানাটানি করেছে লোকটা? ইস্কুলের সেই যে কি ইসপোর্ট হয় জানিস না...সেই যেরে...ঐ কাছি ধরে টানাটানি। প্রায় তার কাছাকাছি।'

'হুঁ, ওয়ার অব্ টাগ।'

হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে বিশদ করেন,—'ওয়ার মানে যুদ্ধ,—বালিশের ওয়াড়ও হয় আবার,—সে আলাদা ওয়াড়—'

গোবর্ধন বাধা দেয়,—'কেন, আলাদা হবে কেন? আমরা ছোটবেলায় বালিশ নিয়ে যুদ্ধ করিনি? কত বালিশের তুলো বের করে দিলাম!'

'দূর মুখ্যু, বালিশের ওয়াড় বুঝি ওকে বলে? বালিশের জামাকে বলে বালিশের ওয়াড়, তাও জানিস না? ওয়ার অব্ টাগ,—অব মানে হল 'র' আর টাগ? টাগ মানে কী?'

'কী জানি! টাক-ফাক হবে।'

'তাই হবে বোধহয়। ওয়ারের চোটে প্রায় টাক পড়ে গেছে আমার! হ্যাঁ, কথাটা হবে ওয়ার অব্ টাক, বুঝলি? লোকের মুখে মুখে 'টাক' 'টাগ' হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

গোবরা মুখখানা গম্ভীর করে,—'উঃ, কাল থেকে কী টেকো লোকই না দেখছি রাস্তায়! কলকাতার লোকের এত টাক কেন বোঝা গেল এখন।'

'কেন?'

'এইসব দোকানে চুল ছাঁটিয়ে—এই ছাঁটার জন্যেই। দু-বার ছাঁটলেই টাক—চাঁদি চক্‌চকে। বিলকুল সব পরিষ্কার! চুল ছাঁটালেই চুল ধরে টানতে দিতে হবে—এই হল গিয়ে কলকাতার নিয়ম।'

'বলিস কী! ভাগ্যিস গোঁফ ছাঁটি নি! তাহ'লে কী সর্বনাশ না হত!' হর্ষবর্ধন সভয়ে গোঁফ চুমরান। গোঁফ তাঁর ভারি আদরের এবং এই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার ভাগ ইচ্ছা থাকলেও তাঁর ভাইকে দেবার আর উপায় ছিল না।

নবম ধাক্কা

যতদূর সম্ভব এবং নাপিতের সাধ্য নিশ্চুল তো হয়েছেন, অতঃপর কী করা যায় এই কথাই হর্ষবর্ধন ভাবছিলেন। দ্রষ্টব্য দেখতেই তিনি বাড়ি থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন, অবশেষে এখানে এসে চাপ্‌তব্য জিনিসেরও সাক্ষাৎ পেলেন—মোটর গাড়ি থেকে মায় কলার খোসা পর্যন্ত চাপতে কিছুই আর বাকি রইল না—এমনকি যা তাঁর দুঃস্বপ্নেরও দূর-গোচর ছিল এমন ভয়াবহ সেই ছাঁট্‌তব্য কাজটাও তিনি এইমাত্র সমাধা করে এসেছেন। অতঃপর আর কী করা যায়?

গোবর্ধনের কাছে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন কিন্তু তার চিন্তাধারা যে অন্য পথে খেলছিল তা প্রকাশ পেতেও দেরি হল না। সে বলল,—'কেন? চাপ্‌তব্য তো কতই এখনও বাকি রয়ে গেল! টেরাম আর গরুর গাড়ি তো চাপিই নি এখনো। রিক্‌শো না কি বলে—ওই যে মানুষ-টানা দু'চাকার—ওর রসও তো এখন টের পেলুম না! তেতালা মোটরের কথা ছেড়েই দাও। ইস্টিশনে সেই যে ট্যাক্সি না টাশ্‌কি কি বলছিল

তাও চাপা হয়নি। দাদা, এস, ঐ রকম একটা প'চকে মোটর ভাড়া করে ঘোরা যাক ততক্ষণ।'

'থাম থাম! তোর কেবল মোটর আর মোটর!' হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন,—'কেন, কলার খোসায় যে চাপা গেল সেটা কি চাপা নয়? কটা লোক চাপতে পারে?'

'সে তো তুমিই কেবল চেপেছ। আমি তো চাপিনি!'

'কে বারণ করছে চাপতে? একঝুড়ি কলা কিনে ফেললেই হল! কলার খোসা মোটরের চেয়ে জোরে যায়—হ্যাঁ! চোখে-কানে দেখতে দেয় না! হুঁ!'

'তা বেশ, কেনো না কেন? ওই তো ওখানে ঝুড়িতে বসে বিক্রি করছে। আমি টাশ্‌কি চেপে কলা খেয়ে খেয়ে খোসা ফেলতে ফেলতে যাই, আর তুমি পেছনে পেছনে খোসায় চেপে চেপে আসতে থাকো। আমি বরাবর জুগিয়ে যেতে পারব, খোসার অভাব হবে না তোমার, তা বলে রাখছি।'

গোবর্ধনের প্ল্যানটা হর্ষবর্ধনের ঠিক মনঃপূত হয় না। তিনি ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বলেন,—'উঁহু!' খানিক পরে পুনরায় নিজের কথায় সায় দেন—'তা হয় না।'

কোন্‌টা হয় না, টাশ্‌কি চাপা না কলা খাওয়া, গোবর্ধন দাদার মন্তব্য থেকে সেই দুরূহ তত্ত্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাচ্ছে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক এসে উভয়কে অভিবাদন করল। 'খবর-কাগজ দেব বাবু?' লোকটা কাগজওয়ালা।

'কাগজে কী হবে আর?' হর্ষবর্ধন চিন্তা করে বলেন, 'চুলছাঁটা তো হয়েই গেছে।'

গোবর্ধন বলে,—'শালুনে চুল ছাঁটতে গেলে তো কাগজের দরকার হয় না, ওরা কাপড় মুড়ে দেয়।'

'খবর-কাগজ থাকলে কে যেত ঐ হতভাগার শালুনে? ওর চেয়ে কাগজে মাথা গলিয়ে উবু হয়ে বসে ঘরোয়া নাপিতের কাছে ছাঁটানো ঢের ভাল! হ্যাঁ, ঢের ভাল!' এই বলে হর্ষবর্ধন হকারের দিকে ঝোঁক দেন,—'তা বাপু, একটু যদি আগে আসতে—নেওয়া যেত তোমার একখান কাগজ। গোবরা ছাঁটবি নাকি, নেব কাগজ?'

'এসেছে যখন আশা করে—কেন একখান।'

কাগজওয়ালা সেদিনকার একখানা বাঙলা কাগজ হর্ষবর্ধনের হাতে দেয়। মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়।

'এ কী কাগজ? এত ছোট কেন? এ তো আমাদের পুরোনো হিতবাদী নয়! না বাপু, আমাকে প্রকাণ্ড বড় একখানা দাও—হিতবাদীই দাও

কিংবা হিতবাদীর মতন। আজকের হোক, পুরোনো হোক তাতে ক্ষতি নেই। টুকরো-টাকরা এতগুলি আমার কী কাজে লাগবে? মাথা গললেও গা ঢাকা তো পড়বে না এতে?'

'পেতে বসা যাবে অন্তত!' গোবরা আর-একটা সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের দিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—'যদি টেবিলগুলোয় ছারপোকা থাকে দাদা?'

'হ্যাঁ, তবে দাও তোমার কাগজ।' হর্ষবর্ধন ঠন্ করে একটা টাকা ফেলে দেন।

'কোন্ কোন্ কাগজ দেব বাবু?' হকার সপ্রশ্ন হয়।

'যা' যা' আছে দাও না কেন তোমার। এক টাকার মধ্যে কিন্তু—ওর বেশি কিনতে পারব না এখন।' লোকটার বিস্ময়বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠবার আগেই আবার তাকে কাবু করে দেন—'কি কাগজ দিচ্ছিলে তুমি—তাই না-হয় দাও এক টাকার। ঘর তো একখান নয়, টেবিল চেয়ারও অনেক।'

গোবর্ধন যোগ করে,—'আর যদি থেকে থাকে তাহলে ছায়পোকাও অঢেল হবে।'

হকার তার বগলের সমস্ত কাগজ গুণতে থাকে, হর্ষবর্ধন তার থেকে একখানা টেনে নিয়ে ভাইয়ের হাতে দেন,—'কী কাগজ পড়ে দ্যাখ্‌তো গোবরা! হিতবাদী যে নয় তা আমি না-পড়েই বলতে পারি। তবে হ্যাঁ, হিতবাদীর বাচ্চা হতে পারে।'

'হ্যাঁ, বাচ্চা হাতি—বাচ্চা হিতবাদীর মতই দেখতে দাদা!' গোবর্ধন নামটা পড়বার চেষ্টা করে,—'বলছে, আনন্দবাজার পত্রিকা।'

'ঠিক হয়েছে। কলকাতার হাট-বাজারের সব খবর রয়েছে এতে। সবাই তো কলকাতায় আমাদের মত বেড়াতে আর টাকা ওড়াতে আসে না, হাট-বাজার কেনা-কাটা করতেই অনেকের আসা হয়। তাদের সুবিধের জন্যেই এই কাগজ,—বুঝতে পেরেছিস গোবরা?'

'যাতে লোকে, মানে যারা পাড়াগেঁয়ে, অনর্থক না ঠকে যায়—বেশ আনন্দের সঙ্গে বাজার করতে পারে। অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি আমি।'

'হ্যাঁ, তা বুঝবিই তো! বলে দিলুম কিনা!' হর্ষবর্ধন গোবরার ওপর-চালে ঠিক আপ্যায়িত হতে পারেন না,—'এইজন্যেই তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না!'

এই বলে তিনি ভাইয়ের প্রতি আর দৃকপাত না করে হকারের বিষয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন,—'হ্যাঁ হে বাপু, তোমার কাছে 'জগুবাবুর বাজার' বলে কোন কাগজ আছে? নেই? কাছে না থাক একটু পরে এনে দিতে পারবে তো? পুরোনো হলেও চলবে, পুরোনো খবরও পড়া যায়,—খবর থাকলেই হল, খবর পড়া নিয়ে কথা। আজকের খবর আজকেই

পড়তে হবে তার কোন মানে নেই। ঐ আমাদের বাড়ি, ওখানে গিয়ে দিয়ে এলেই হবে ; অ্যাঁ? কি বলছ? ও নামে কোন কাগজই নেই? একদম নেই? উ'হ্—অসম্ভব! এ কখনও হতে পারে? জগুবাবুর বাজার যখন আছে তখন কাগজও নিশ্চয় আছে ওখানকার—না, জগুবাবুর বাজারই নেই তুমি বলতে চাও? বাজার আছে? বাজার আছে তো কাগজ নেই কেন হে! আশ্চর্য! থাকলে ভাল হত। সেই কর্মচারীটা জগুবাবুর বাজারের কাছে কাল নাইস হোটেলের কথা বলেছিল, তার সমস্ত খবর বিশদে জানা যেত তাহলে।'

হকারটা ঘাড় নেড়ে জবাব দিচ্ছিল, এতক্ষণে কথা বলার ফুরসুৎ পেল—'সাড়ে দশ আনার কেবল হল বাবু! আর সাড়ে পাঁচ আনার আনন্দবাজার আমি একটু পরেই দিয়ে আসব আপনার ওই বাসায়—দিয়ে যাব ঠিক, ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন কাগজের তাড়া গোবরার কাঁধে চাপিয়ে দেন, দিয়ে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করে বিনা বাক্যব্যয়ে অবলীলায় বাড়ির অভিমুখে রওনা হন। তখনকার মত ভাইয়ের প্রতি তাঁর আর চিত্ত নেই। তাঁর মনের মধ্যে গজগজ হতে থাকে, 'আমি বললাম বলে তাই জানল, আর বলে কিনা জানি, অনেক আগেই জানতাম! কী ভয়ানক মিথ্যেবাদী দেখেছ! ইস, এমন জানোয়ার নিয়ে মানুষ কলকাতায় আসে!'

তাড়া-স্কন্ধে গোবর্ধন দাদার অনুসরণ করে—সেও কোন কথা বলে না। কোন্‌খানে যে তার দোষ হল যে-অপরাধে দাদা চটে গেলেন, তার ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে অনেক আন্দোলিত করেও সে তার কাছাকাছি পেঁছিতে পারে না। তার অন্তঃকরণেও ফোঁস-ফোঁসানি শুরু হয়,—'তা যাবে তো যাও না বাপু কলার খোসা চেপে! আমি কি বারণ করেছি, না, বাধা দিচ্ছি? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, আর তোমার দৌড় ঐ ধড়াম্‌তলা! ঐখানে পেঁছিছ কি অমনি আর-একটি ধড়াম্! ব্যাস! ধড় এবার আস্ত থাকলে হয়! ধড় তো নয়, যেন ভূধর!'

বাড়ির ভেতরে গিয়েও রফার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কেউ কারু সঙ্গে কথা বলে না, নিঃশব্দে যত টেবিল চেয়ারের উপর কাগজ পেতে চলে। সমস্ত ঘর নিঃশেষ করে বসবার কামরায় এসে দেখে ডেন্টিস্টের সম্পর্কিত দাড়ি-ইচ্ছুক সেই ছেলেটি চেয়ারের একখানা কাগজ অপসারিত করে একমনে পড়ে চলেছে।

দাঁত তুলবার জন্যে বোধহয় ডাকতে এসেছে—গোবরার এইরকম আশঙ্কা হয়, সে ভ্রুকুটি-কুটিল নেত্রে তাকিয়ে থাকে। হর্ষবর্ধন স্মিতমুখে ওকে অভ্যর্থনা করেন,—'কী, কন্দুর এগুলো তোমার দাড়ি?'

ছেলেটি অপ্রতিভের মত একটু হাসে,—'আজকের কাগজটা একবার

দেখতে এলাম। গোরা বলছিল,—আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—কে একজন পৃথ্বীশ রায় নাকি অমনি-অমনি উড়োজাহাজে করে ইটালি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তা দেখছি সত্যিই বটে!'

'উড়োজাহাজ করে! অ্যাঁ—তাই বললে না তুমি?' হর্ষবর্ধন অবাক হয়ে যান—'জাহাজ আজকাল উড়ছে নাকি?'

গোবরা বলে,—'আমি তো জানতাম ওরা কেবল ডুবে যায়। কথায় বলে, জাহাজডুবি!'

'তুই থাম্! তুই তো সব জানিতস! গোবর্ধনকে ধমক দিয়ে হর্ষবর্ধন ছেলেটির অভিমতের অপেক্ষা করেন,—'খবর-কাগজে লিখেছে? ছাপার অক্ষরে? কই দেখি! যখন ছেপে দিয়েছে তখন সত্যিই হবে।'

তিনজনেই একসঙ্গে কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং তিন-জোড়া বিস্মিত দৃষ্টি একত্র হয়। হ্যাঁ, সত্যিই বটে! স্পষ্ট অক্ষরেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে আটাশ বছর থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স এমন দু-জন দুঃসাহসিক সহযাত্রী চেয়েছেন পৃথ্বীশ রায়। তাদের তিনি ইটালি নিয়ে যাবেন, আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন—ইত্যাদি, এইরকম অনেক কিছুই লেখা রয়েছে সেই কাগজে।

'প্রায় মাসখানেক থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, গোরা অনেক আগেই আমায় বলেছিল। কিন্তু আমাকে কি নিয়ে যাবে?' ছেলেটি হর্ষবর্ধনের সম্মতির অপেক্ষা করে,—'আমাকে কি আটাশ বছরের মত দেখতে? ঠিক বলুন তো? ভালো করে তাকিয়ে বলুন।'

হর্ষবর্ধন দারুণ ঘাড় নাড়েন,—'মোটেই না। একদম না, বরং আট বছরের মতই অনেকটা। আমাদের আসামের অনেক আট বছরের ছেলে তোমার মত দেখতে হয়।'

'সেইজন্যেই তো মাসখানেক থেকে, মানে যেদিন গোরার কাছে শুনেছি সেদিন থেকেই দাড়ি কামাতে লেগেছি। কিন্তু কই, এতদিনেও দাড়ি বেরুল না তো!' হতাশভাবে বার-দুয়েক সে গালে হাত বুলোয়—'দাড়ি বেরুলেও না-হয় আটাশ বলে নিজেকে চালাতে পারতাম। কিংবা যদি আগে থেকে আসামে জন্মাতাম তাহলেও হতে পারত হয়ত। আপনি বললেন না যে আট বছরের ছেলেও সেখানে প্রায় ডবল হয় দেখতে—'

গোবর্ধন বলে,—'নিশ্চয়! আবার আট বছরেই অনেকের গোঁফ দাড়ি বেরিয়ে যায়।'

আসামী বালকের সৌভাগ্যে ছেলেটি ঈর্ষান্বিত হয়,—'তাহলে এমনিতেই তো আমি আটাশ বছরের মত দেখতে হতুম! আর দাড়িও হত সেইসঙ্গে! মায় গোঁফ পর্যন্ত বেরিয়ে যেত আমার। তাহলে ইটালি যাবার তবে বাধা ছিল কী!'

হর্ষবর্ধন বলেন,—'কিছু না।'

'মাসখানেকের জন্যে আসামে চেঞ্জে গেলেও তো হয়! হয় না?'

'হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে খুব কষে আসামী দুধ ঘি খেলেও তোমার চেহারা ডবল হয়ে যাবে এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। তবে ঐ দাড়ির কথাটা—'

গোবর্ধন দাদার বাক্য সমাপ্ত করে দেয়,—'দাড়ি গজায় জলবায়ুর গুণে। চীন দেশে যে একেবারেই হয় না, তার কী করছি বল? এ তো মিথ্যে কথা নয়, নিজের চোখে দেখলাম কাল সকালে।'

'আচ্ছা, আমি যদি আসামে গিয়ে দাড়িতে জলপটি লাগিয়ে রাখি আর দিনরাত পাখার বাতাস করি তাহলেও কি এক মাসে আমার দাড়ি গজাবে না? সে গোবর্ধনকে জিজ্ঞাসা করে এবার। —'হবে না দাড়ি?'

'হবে না? আলবৎ হবে! হতেই হবে দাড়িকে—জল হাওয়ার গুণ তবে কী?' গোবর্ধন সজোরে জবাব দেয়।

'তবে তাই যাই, বাবাকে বলে কয়ে দেখি গেল। আসামে যেতে হলে বাবার পারমিশন নিতে হবে। আপনাদের সঙ্গে যদি যেতে দেয় তো হয়।' ছেলেটি চলে যায়।

'ইটালি কোথায় দাদা?' গোবর্ধন ভয়ে-ভয়ে দাদাকে জিগেস করে।

'কোথায় আবার! বিলেতে।' হর্ষবর্ধনের বিরক্তি তখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

'বিলেত আর ইটালি কি এক জায়গা নাকি?'

'নিশ্চয়! খাপরার ইংরিজি যেমন টালি, বিতেলের ইংরিজি তেমনি ইটালি।'

'এইবার বুঝেছি।' গোবর্ধন মাথা নাড়ে,—'নেপালের ইংরিজি যেমন ভুটানি।'

হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ প্রীত হন,—'কিন্তু সে কথা তো নয়, আমি ভাবছি কি—'

গোবর্ধন দুর্ভাবিত দাদার দুশ্চিন্তার অংশ নেবার ব্যগ্রতা ব্যক্ত করে,—'বল না দাদা কী ভাবছ তুমি?'

'ভাবছি যে আমাদের বয়স কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে—তার বুদ্ধির সমস্ত দরজা-জানলা যেন একযোগে অকস্মাৎ খুলে যায়,—'হ্যাঁ! ভারি চমৎকার হয় দাদা! এই জন্যেই তো তোমাকে দাদা বলি! তোমাকে গড় করি এইজন্যই।' তারপর একটু দম নেয়,—'তাহলে উড়োজাহাজেও চড়া হয়—জাহাজেই চাপিনি তো উড়োজাহাজ!'

'তুই আছিস কেবল চাপবার তালে! আমাকে কত দিক ভাবতে হয়! ছেলেমানুষ সঙ্গে নিয়ে বিদেশে এসেছি, তার উপরে বিদেশ থেকে আরো

বিদেশে—। আটাশ হলে কি হয়, তুই ওই ছোঁড়াটার চেয়েও অপোগণ্ড! উড়োজাহাজ উলটে গিয়ে যদি আকাশ থেকে ঝপাৎ করে পড়ে যাস তখন কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে তোকে? হাওয়ার চোটে কোন্ মুলুকে কোথায় যে উড়ে যাবি কে জানে! অত উঁচু আকাশে হাওয়ার জোর কি কম।'

'পড়ব কেন? আমি তোমাকে ধরে থাকব দেখো।'

'হ্যাঁ, তাহলে হয়। আমি বেশ ভারি আছি, সহজে আমাকে ওলটাতে পারবে না।'

'তবে আর ইটালী যেতে বাধা কী আমাদের? বয়েস তো আছেই, তাছাড়া দাড়িও রয়েছে—উড়োজাহাজে চাপতে হলে যা যা চাই।'

'আমি তাই ভাবছিলুম। এ-দুদিন কলকাতা তো বহুৎ দেখলাম, এখন বিলেতটা একটু দেখে আসা যাক বরং।' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন,—'বিলেতের হালচাল আমার কী রকম কে জানে!'

'হ্যাঁ, উড়োজাহাজে চাপতে পারলে মোটরে না চাপলেও চলে যায়, তত দুঃখ থাকে না আর। তবে চল দাদা, বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা কারু কাছে বাৎলে নিয়ে এক্ষুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি। নইলে অন্য সকলে আমাদের আগে গিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলবে। দেশে দাড়িওয়ালার তো আর অভাব নেই!'

'আচ্ছা আমরা যে ইটালি যাব, সেই কথাই যে আমি ভাবছিলাম তা কি তুই জানতে পেরেছিলি?' হর্ষবর্ধন মুরুব্বির মত একখানা চাল দেন।

'একদম না।' সরল গোবর্ধন সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়।

'আমি কিন্তু জানতে পেরেছিলাম। খবর-কাগজ পড়ে নয়, যেদিন বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছি তখনই জেনেছিলাম যে আমাদের ইটালি যেতে হবে। জানিস?'

গোবর্ধনের সংশয় হয়, প্রায় প্রতিবাদ করে বসে আর কি, কিন্তু উড়োজাহাজে চাপবার লোভে চেপে যায় সে। গোঁফে চাড়া দেন হর্ষবর্ধন,—'তোর চেয়ে কত বেশি জানি আমি, দ্যাখ্!'

গোবর্ধন মৌন সম্মতি জানায়, তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার প্রবল ভাবের সূত্রপাত হয়।

দশম ধাক্কা

বিখ্যাত বিমানবীর পৃথ্বীশ রায়ের নাম শুনেছ নিশ্চয়। তাঁর খেয়াল হয়েছে, নিজের মনো-প্লেনে ইটালি যাবেন—একেবারে ননস্টপ ফ্লাইট,

কলকাতা থেকে ইটালি এবং ইটালি থেকে ফিরে ফের কলকাতা।

বাঙালীদের মুখোজ্জ্বল করতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখ খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না সকাল থেকে। দু'জন সহযাত্রী চেয়ে খবরের কাগজে তিনি ইস্তাহার দিয়েছিলেন, তার পনের ষোল হাজার জবাব এসেছে কিন্তু প্রায় সবই পনের ষোল বছরের ছেলেদের কাছ থেকে।

তিনি চেয়েছিলেন দু'জন সাবালক সহযাত্রী, আটাশ থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স, স্পষ্ট করে সে কথা জানিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বয়সের কোন লোক যে সম্প্রতি বাংলা দেশে আছে, হাজার হাজার আবেদনের ভেতরে তার কোন প্রমাণ তিনি পাচ্ছেন না।

না, সেরূপ কোনো অবদানের আবেদন নেই।

তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই, আর যদিই বা এরোপ্লেন বিকল হয় তখন প্যারাসুট রয়েছে। কিন্তু বয়স্ক বাঙালীরা প্রাণরক্ষার প্রলোভনে সহজে পড়তে রাজি নয় স্পষ্টই তা বোঝা যাচ্ছে। অনেক ইস্কুলের মেয়েও যেতে চেয়েছে, আট বছরের ছেলেদের কাছ থেকেও অনুরোধ এসেছে কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে একজনও না।

পৃথ্বীশ রায় খামের পর খাম খুলছেন আর ঘাড় নাড়ছেন—হ্যাঁ, এইসব ছেলেমেয়েরা যেদিন বড় হবে সেদিন আমাদের দেশও বড় হবে, কিন্তু ততদিন—! নাঃ, আটাশ বছর কি আটাশি বছর আর অপেক্ষা করবার মতো সময় আমার হাতে নেই। সহযাত্রী বা না-সহযাত্রী, আজই আমাকে যাত্রা করতে হবে।'

একটি ছেলে লিখেছে,—'দেখুন, আমি আপনার সাথী হতে রাজি আছি, কিন্তু একটা শর্তে! আপনাকে এক সময়ে এরোপ্লেন বিকল করতে হবে, যেমন বায়োস্কোপে দেখা যায় তেমন হলেও চলবে ; এরোপ্লেনে আগুন লাগিয়েও দিতে পারেন, তাতেও আমার বিশেষ আপত্তি নেই। কেবল আমাকে প্যারাসুটে নামবার সুযোগটা দিতে হবে। অজানা দেশে অচেনা লোকেদের মধ্যে হঠাৎ আকাশ থেকে নামতে ভারি মজা হয় কিন্তু—!'

আর একটা চিঠির বক্তব্য,—'আমাকে কি আপনি সঙ্গে নেবেন? আমার একটা মুস্কিল আছে। আমার বয়স আটাশ বছর কিন্তু দেখতে ভারি ছোট দেখায়। দেখলে আপনার মনে হবে বারো কি চোদ্দ—এই হয়েছে গণ্ডগোল। এইজন্যে আমাকে ইস্কুলেও খুব নিচু কেলাসে ভর্তি করে দিয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি বলছি আমার আটাশ বছর বয়স—সবে আটাশ পেরোলাম সেদিন। আপনি না হয় আমাদের পাড়ার টুনুকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।'

এই দুটি আবেদন সম্পর্কে গুরুতর বিবেচনা করছেন, এমন সময়ে

দুটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পৃথ্বীশ রায় মুখ তুলে চাইলেন,—'কে আপনারা?'

এক নম্বর ভদ্রলোক দু-নম্বরকে দেখিয়ে বললেন,—'উনি হচ্ছেন হর্ষবর্ধন। আমার দাদা।'

দু-নম্বর বললেন,—'আর ওর নাম গোবরা।'

এক নম্বর সংশোধন করে দিলো,—'উঁহু। শ্রীমান গোবর্ধন।'

পৃথ্বীশ রায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন,—'তা, কী চাই আপনাদের?'

হর্ষবর্ধন বলেন,—'আমরা আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে চাই।'

গোবর্ধন আবার সংশোধন করে,—'উঁহু! উড়ে আসতে।'

'ওঃ, উড়োজাহাজে ইটালি যাবেন? বেশ তো, বেশ তো! তা আপনাদের বয়েস?'

হর্ষবর্ধন ভাল করে গোঁফ চুমরে নেন,—'আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধনও প্রয়োজন-মত গম্ভীর গলায় সায় দেয়,—'হুঁ, তার থেকে এক দিনও কম নয়।'

এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না; পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'তবে কাল সকাল দশটার সময় হাজির থাকবেন দমদমে। দমদম এরোড্রোম, বুঝলেন?'

হর্ষবর্ধন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন,—'তা, ভাড়া কত পড়বে? খুব বেশি নয় তো?'

গোবর্ধন বলে,—'দশ হাজার পর্যন্ত আমরা উঠতে পারি। বেশি টাকা তো সঙ্গে আনা হয়নি!'

'হ্যাঁ, আসাম থেকে কলকাতায় এসেছি বেড়াতে। বিলেত যাওয়ার মতলব ছিল না তো আগে! তা, আপনি যখন খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন যে তিন দিনে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন—'

গোবর্ধন মাঝখানে বাধা দেয়,—'উড়িয়ে আনবেন।'

'হ্যাঁ, বিলেত উড়িয়ে আনবেন, তখন আমরা ভাবলাম, মন্দ কী? এই ফাঁকে বিলেত ঘুরে—ওর নাম কি—বিলেত উড়ে আসা যাক না!'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'আপনাদের সহযাত্রী পাচ্ছি এই আমার সৌভাগ্য! এক পয়সাও লাগবে না আপনাদের।'

গোবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে,—'অ্যাঁ, বলে কী দাদা! বিনে পয়সায় বিলেত!'

হর্ষবর্ধনও কম অবাক হন না,—'ওমনি-ওমনি নিয়ে যাবেন?'

'নিয়ে যাব আবার নিয়ে আসব—একদম মুফৎ! বরং আপনারা দাবি করলে কিছু ধরে দিতে রাজি আছি এর ওপরে।'

হর্ষবর্ধনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না,—'না, আমরা কিছুই চাই না।

আমরা তো রোজগার করতে কলকাতায় আসিনি, টাকা ওড়াতেই এসেছি।'

'কিন্তু দেখছ তো দাদা, টাকা ওড়ানো কত শক্ত এখানে!' গোবর্ধন যোগ করে,—'আমি তখনই বলেছিলাম তোমায়!'

হর্ষবর্ধন পিছপা হবার পাত্র নন, 'তা বেশ, বিনে পয়সায়ই সই, ওমনিই যাব বিলেত। তার কী হয়েছে?'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'একটু ভুল করছেন। বিলেত নয়, ইটালি।'

'ওই যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। বিলেত আর ইটালি একই কথা। সমুদ্দুর পেরুলেই বিলেত, তা ইটালিই কি আর আন্দামানই কি?'

গোবর্ধন অমায়িকভাবে বসাতে থাকে,—'ও আর আমাদের বোঝাতে হবে না।'

পৃথ্বীশ রায় বলতে শুরু করলে,—'দেখুন, যদিও উড়োজাহাজে প্রাণ-হানির কোন ভয় নেই, তবু—'

হর্ষবর্ধন বাধা দেন,—'আমরা জানি। আকাশে আবার ভয় কিসের? এ তো রেলগাড়ি নয় যে কলিশন হবে! আর আকাশে এন্তার ফাঁকা, কোথায় কার সাথে বা ধাক্কা লাগবে বলুন! তুই কী বলিস রে গোবরা?'

গোবরা জবাব দেয়,—'তুমিই বল না, কোন পাখিকে কি কখনো মরতে দেখা গেছে? মানে খাঁচার পাখি নয়, আকাশের পাখিকে? আকাশে যারা ওড়ে তাদের মরণ নেই দাদা! আর উড়োজাহাজ তো বলতে গেলে পাখির সগোত্রই। এখুনি পথে আসতে আসতে দেখলে না—ইয়া বড়-বড় দুই পাখা!'

পৃথ্বীশ রায় তথাপি বোঝাতে চেষ্টা করেন,—'তা বটে, পাখা থাকলেই পাখি হয় বটে, কিন্তু আরশোলা আর এরোপ্লেন বাদ। কিন্তু আমার কথা তো তা নয়! প্রাণহানির ভয় নেই সে কথা সত্যি, তবু আমি বলছিলাম কি, আপনাদের কি লাইফ ইন্শিওর করা আছে? নেই? তা, একটা করে ফেলুন না কেন যাত্রার আগে, বলা যায় না তো! যদিই একটা বিপদ আপদ ঘটে যায়, একটা প্রিমিয়াম দেয়া থাকলে আত্মীয়-পরিবার তখন টাকাটা পাবে।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—'হ্যাঁ, লাইফ ইন্শিওর জানি বই-কি! আসামের জঙ্গলেও ওরা গেছে। তা আপনি যখন বলছেন, পঞ্চাশ হাজার কি লাখ খানেকের একটা করে ফেলা যাক। তবে আমার নামেই করুন, ওর নামে করে কাজ নেই—ও কখনো মরবে না। আমি ম'লে টাকাটা যেন গোবরাই পায়। হ্যাঁ, যা বলেছেন, যদিই দৈবাৎ উড়ো কল বেগড়ায়, বলা যায় না তো! পড়লেই তো সব চুরমার—হাড়গোড় একদম ছাতু! তখন কি আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে!'

পৃথ্বীশ রায় জিজ্ঞাসা করেন—'ওঃ, উনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন না তাহলে?'

'নিশ্চয়ই যাচ্ছে! যাচ্ছে না কে বললে? ওকে ছেড়ে আমি যমের বাড়ি যেতেও রাজি নই', হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জবাব দেন,—'বিলেত তো বিলেত!'

পৃথ্বীশ রায়ের উড়োজাহাজ ইটালির এরোড্রোমে পৌঁছতেই সেখানকার প্রবাসী বাঙালীরা ভিড় করে এল। অভিবাদন ও অভিনন্দনের পালা সাঙ্গ হলে হর্ষবর্ধন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন,—'দেখছিস গোবরা, বাংলা ভাষাটা কী রকম ছড়িয়ে পড়েছে আজকাল!'

'হুঁ দাদা, নইলে বিলিতি সাহেবদের মুখে বাংলা বুলি!'

পৃথ্বীশ রায় বুঝিয়ে দেন যে সমাগত ভদ্রলোকদের সাহেবি পোশাক হলেও আসলে তাঁরা বাঙালী, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা পড়াশুনোর ব্যাপারেই এঁদের এই বিদেশে বাস; বাঙালী বলেই বাঙালীকে সম্বর্ধনা করতেই সবাই এসেছেন। তখন দুই ভাই দস্তুরমত অবাক হয়ে যায়। 'বটে? বুঝেছি তাহ'লে, কাঠের কারবার নিয়েই এদের এখানে থাকা!' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়তে থাকেন।

'তা আর বলতে!' গোবর্ধন যোগদান করে,—'কাঠের জন্যে আসামের জঙ্গলে গিয়ে মানুষ বাস করে, তা বিলেতে আসবে যে আর বেশি কী?'

পৃথ্বীশ রায় জানান যে সন্ধ্যার মুখেই ওঁরা দেশমুখো হবেন; এঞ্জিনের অবস্থা ভাল নয়, এইজন্যে সারাটা দিন ওঁর কল মেরামত করতেই যাবে। হর্ষবর্ধন বলেন,—'তাহ'লে এই ফাঁকে এই বিলিতি শহরটা দেখে নেওয়া যাক না কেন?'

গোবর্ধন সায় দেয়,—'হুঁ, পুরো একটা দিন পাওয়া যাচ্ছে যখন!'

মুকুল ব'লে একটি বছর পনের ষোলর ছেলে এগিয়ে আসে,—'আসুন, এখানে যা যা দেখবার আছে আপনাদের সব দেখাব আমি।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন,—'অ্যাঁ, এইটুকুন ছেলে তুমিও কাঠের কারবারে লেগেছ? এই বয়সেই?'

মুকুল বলে,—'না, আমার বাবা ডাক্তার।'

গোবর্ধন ব্যাখ্যা করে, 'তার মানে, তিনি তোমাকে ব্যবসাতে সাহায্য করেন। মরলেই তো কাঠের খরচ!'

হর্ষবর্ধন পুলকিত হয়ে ওঠেন, 'বাপ ডাক্তার, ছেলের কাঠের কারবার; এর চেয়ে আর লাভের কী আছে? ব্যবসার দুটো দিকই একচেটে—ডবল লাভ! আমার ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়াব। আর নাতিকে দেব আমাদের কারবারে, বুঝলি গোবরা?'

পৃথ্বীশ রায় মনে করিয়ে দেন—'আপনারা সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন কিন্তু।'

'সে আর ব'লে দিতে হবে না। আপনি আমাদের ফেলে চলে গেলেই তো হয়েছে! সব অন্ধকার! এখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরা আমাদের কম্ম নয়!'

গোবর্ধন মিনতি জানায়,—'দোহাই, তা যেন যাবেন না! দেখছেন তো, দাদা যা মোটা, একটু হাঁটলেই ওঁর হাঁপ ধরে। আমি হাঁটতে পারলেও দাদা পারবে না।'

হর্ষবর্ধনের আত্মসম্মানে ঘা লাগে,—'হুঁ! দাদা পারবে না! নিশ্চয় পারবে, আলবৎ পারবে, দাদার ঘাড় পারবে! হেঁটে দেখিয়ে দেব?' গোঁফে তা' দিতে দিতে সদর্পে তিনি অগ্রসর হন।

'আসুন আপনারা আমার মোটরে।' হর্ষবর্ধনের অভিযানে মুকুল বাধা দেয়,—'ঐ যে আমার বেবিকার ঐখানে, আমি নিজেই ড্রাইভ করি।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন থামেন না, তাঁর অগ্রগতি ততক্ষণে শুরু হয়েছে। গোবর্ধন সভয়ে দাদার বিরাট পদক্ষেপ দেখতে থাকে, তার আশঙ্কা হয়, হয়ত একেবারে আসাম না গিয়ে দাদা শান্ত হবেন না। কিন্তু সন্দেহ অমূলক, হর্ষবর্ধন সটান গিয়ে মোটরে পেঁছেই গ্যাঁট হয়ে বসেন।

তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে গোবর্ধনও দাদার অনুসরণ করে। কিন্তু হর্ষবর্ধন ভায়ের দিকে দৃকপাত করেন না, তিনি ভয়ানক চ'টে গেছেন, তিনি নাকি ভয়ানক মোটা, হাঁটতে গেলে তাঁর হাঁপ ধ'রে যায়—দেশে হ'লেও ক্ষতি ছিল না' কিন্তু বিলেতে এসে তাঁকে এমনধারা অপমান, যতো বাঙালী সাহেবদের সামনে, ছি! ছি! তিনি জোরে জোরে গোঁফে তা' দিতে থাকেন।

মুকুল ওঁদের মিউজিয়মে নিয়ে যায়, সেখান থেকে চিত্রশালায়। 'এই যে সব চমৎকার চমৎকার ছবি দেখছেন, এসব হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর। পৃথিবীর একজন নামজাদা বড় আর্টিস্ট।'

'আঁ, বল কী? আমাদের মাইকেল? বিলেতে এসে ছবি আঁকত সে? বটে?' হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না!

'মাইকেল এঞ্জেলোকে আপনারা জানলেন কী করে?'

'মাইকেলকে জানি না! তুমি অবাক করলে! তুমি তাঁর মেঘনাদবধ পড়নি?'

মুকুল ঘাড় নাড়ে,—'না তো! আমি জন্ম থেকেই এখানে কিনা, দেশে তো যাইনি কখনো!'

'বল্ না গোবরা, বল্ না সেইটে মুখস্থ—সম্মুখ সমরে পড়ি চূড়বীরা-মণি, বহু বীর—বহু বীর—হুঁ, মনে পড়েছে, বীর বহু চলি যবে গেলা যমপুরে—তার পরে—তার পরে?'

গোবর্ধনও সহজে দমবার নয়,—'হুর্‌রে হুর্‌রে হুর্‌রে করি গর্জিল ইংরাজ, নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ—'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হ'য়ে বাধা দেন,—"উঁহু, উঁহু! ও যে মিলে গেল! মাইকেলের মেলে না। তোর কিছু মনে থাকে না, তুই একটা অপদার্থ! একবারে রাবিশ! আবার আমাকে বলিস হাঁটতে পারে না!"

এতক্ষণে প্রতিশোধ নিতে পেরে হর্ষবর্ধন একটু খুশি হন, মুকুলকে সম্বোধন করেন,—'তুমি মাইকেল পড়নি তো? পড়ে দেখো, অনেক বই আছে মাইকেলের।'

গোবর্ধন বলে,—'পড়লে বোঝা যায় বটে, কিন্তু পড়া চাট্টিখানি নয়। দস্তুরমতন শক্ত। দাঁতভাঙা ব্যাপার!'

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন,—'পড়লে বোঝা যায়? তুই তো সব জানিস মাইকেলের! বল্ দেখি "হস্তী নিনাদিল"—এর মানে কী?'

বার-বার অপমানে গোবর্ধনও গরম হয়,—"তুমি বল দেখি?"

'আমি? আমি জানি না? আমি না জেনেই তোকে জিজ্ঞেস করছি বুঝি?' হর্ষবর্ধন গোঁফ পাকানো ছেড়ে আমতা আমতা করেন,—"এমন কী শক্ত মানেটা শুনি? হস্তী "নিনাদিল"? এ তো জলের মত সোজা! "নিনাদিল"র "নি" বাদ দিলেই টের পাবি। কিংবা "হস্তিনী নাদিল" তাও করা যায়।' গোবর্ধন তাঁর পাণ্ডিত্যে কাবু হয়ে পড়েছে দেখে পুনরায় তিনি গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন,—'হুঁঃ, এই তো তোর বিদ্যে! তবু "হ্রেষাধ্বনি" এখনো তোকে জিজ্ঞাসাই করিনি!'

গোবর্ধন এবার ভীত হয়, 'হ্রেষাধ্বনি' চাপা দেবার জন্যে বলে,—'মাইকেলের ছবিগুলো কিন্তু বেশ, না দাদা?'

'বেশ না ছাই, এর চেয়ে ওর পদ্য ঢের ভাল!'

মুকুল ওদের আরও অনেক কিছু দেখায়, মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য, মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্‌কো, এবং আরও কত কি কারুকার্য! মাইকেল এই বিদেশে এসে এত কাণ্ড করে গেছে ভেবে দু-ভাই কম অবাক হয় না! বলতে গেলে গোটা ইটালিটাই গড়ে পিটে গেছে সেই মাইকেল।

হর্ষবর্ধন মাইকেল-গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠেন,—'মাইকেলের বাড়ি কোথায় ছিল জানিস গোবরা?'

'যশোরে কি খুলনায় যেন।'

'উঁহুঃ, আসামে। আমাদের আসামে। আসামী ছাড়া কেউ অত খাটতে পারে নাকি? কী রকম প্রাণ দিয়ে খেটেছে দ্যাখ!'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন ফাঁসির আসামী!' গোবর্ধন আর দাদার প্রতিবাদ করে না। 'ফাঁসির আসামীর মত প্রাণ দিয়ে খাটতে পারে কেউ?'

মুকুল ওদের বিখ্যাত রোমান ফোরাম দেখায় ; হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন,— 'এও আমাদের মাইকেলের তো?'

'না, তাঁর জন্মাবার হাজার বছরেরও আগের তৈরি।'

'ওঃ!' হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ হতাশ হন।

অতি প্রাচীন কালের একটা প্রস্তর-স্তম্ভের কাছে এসে হর্ষবর্ধন আবার প্রশ্ন করেন,—'মাইকেলের?'

'এ তাঁর জন্মাবার দু' হাজার বছর আগেকার।'

হর্ষবর্ধন দমে যান, মুকুল তাঁকে একটা বিরাট প্রস্তর-মূর্তি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'ওটা কার মূর্তি জানেন?'

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ চোখে তাকান,—'মাইকেলের বোধহয়?'

'উহুঁ। ভাস্কো ডা গামা ; নাম শোনেন নি?'

'গামা, গামা—নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে যেন। খুব কুস্তি করে বেড়াত লোকটা না?'

'ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু কুস্তি-টুস্তির কথা তো পড়িনি কখনো!'

'ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল! তুমি অবাক করলে বাপু! এইমাত্র আমরা তো ভারতবর্ষ থেকেই আসছি, কিন্তু কই এ-রকম কথা তো শুনিনি। অত বড় দেশটা আবিষ্কার করল আর আমরা তার বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলাম না!'

গোবর্ধন বলে,—'তুমি ভুল পড়েছ, ভারতবর্ষ নয়, কুস্তি আবিষ্কার করেছিল গামা। আমি ভালরকম জানি।'

'কি গামা বললে? ভাস্কো ডা গামা? বেশ নামটা। তা লোকটা কি মারা গেছে?'

'অনেক দিন। চারশো বচ্ছরেরও আগে!'

'চারশো বচ্ছর! বল কী হে! তা কিসে মারা গেল সে?'

'তা কী জানি!' মুকুল মাথা নাড়ে।

'বসন্ত বোধহয়?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

'বইয়ে তো পড়ি নি, জানি না।' মুকুল আরও জোরে মাথা নাড়তে থাকে।

গোবর্ধন বলে,—'হামও হতে পারে!'

'হতে পারে—তাও হতে পারে—বেঁচে নেই যখন, কোন কিছুতে মারা গেছে নিশ্চয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে মুকুলের ঘাড়ে ব্যথা হয়।

'বাপ মা আছে?'

'অসম্ভব!' প্রশ্ন শুনে মুকুল আকাশ থেকে পড়ে। 'ছেলেপুলেই বেঁচে নেই তো বাপ মা!'

অবশেষে ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুর সম্মুখীন হয়—মিশরের কোন এক রাজার মামি। মুকুল উৎসাহে লাফাতে থাকে, 'দেখছেন?—মামি! মামি।'

হর্ষবর্ধন কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করেন,—'কী বললে? কী নাম ভদ্রলোকের?'

'নাম? ওর কোন নাম নেই—জিপ্‌সিয়ান মামি!'

'মাইকেলের মত কোন নামজাদা লোক বোধহয়? তা এই বিলেতেই কি এর জন্ম?'

'না—জিপ্‌সিয়ান মামি!'

'আমাদের বাংলা দেশের—মানে, আমাদের আসামের তবে?'

'না, না, বলছি তো, জিপ্‌সিয়ান!' মুকুল এবার ক্ষেপে যায়।

'ও, তাই বল! এতক্ষণে বুঝেছি। ইংরেজ!'

'না, ইংরেজ নয়, ফরাসী নয়, জার্মান নয়, ইটালির লোকও নয়, এমনকি বাঙালীও না—ইজিপ্টায় এর জন্ম।'

'ইজিপ্টায় জন্ম! ইজিপ্টা বলে কোন দেশের নাম তো কখনো শুনি নি!' হর্ষবর্ধন সন্দেহভরে মাথা নাড়েন।

'ইজিপ্টায়, না, ইজিচেয়ারে? তুমি ঠিক জান?' গোবর্ধন প্রশ্ন করে।

'ইজিপ্টা কোনো বিদেশ-টিদেশ হবে। গোবরা, তলায় কী লেখা রয়েছে পড়ে দ্যাখ তো!'

'এফ্-আর্-ও-এম্—ফ্রম্ ; ই, জি, ওয়াই, পি, টি। ফ্রম—ফ্রম মানে হইতে আর ই- জি-ওয়াই-পি-টি?'

'এগ্ওয়াইপ্ট্। এগ্ওয়াইপ্ট্ হইতে। এগ্ মানে ডিম। অর্থাৎ যেখান থেকে আমাদের দেশে ডিম চালান যায় সেখানকার এই লোকটা। বোধহয় কোন ডিমের আড়ৎদার-টাড়ৎদার।'

'মামি—মামি!' গোবর্ধন প্রশ্ন করে,—'তা এর মামা কোথায় গো?'

মুকুলের ঘাড় টন্-টন্ করছিল, সে হাত নেড়ে জানায় যে ওর জানা নেই।

'দেখছিস গোবরা, কি রকম মজা করে শুয়ে আছে লোকটা—কেমন শান্তশিষ্ট মুখের ভাব!'

গোবর্ধন মুকুলের মুখে তাকায়,—'একি—অ্যাঁ—এ কি মারা গেছে নাকি?'

'নিশ্চয়! তিন হাজার বছর!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—'অ্যাঁ, বল কি? তিনি হাজার বছর ধরে এমনি মরে পড়ে রয়েছে?'

গোবর্ধনের বিশ্বাস হয় না,—'তিন হাজার বছর! হতেই পারে না! তিন দিনে মানুষ পচে ওঠে, আর এ কিনা তিন হাজার—'

হর্ষবর্ধনের মুখ এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়,—'শোন ছোকরা, তুমি কী বলতে চাও কও দেখি? বাংলা দেশ থেকে এসেছি ব'লে কি আমাদের বাঙাল পেয়েছ? যা খুশি তাই বুঝিয়ে দিচ্ছ? ছেলেমানুষ ব'লে এতক্ষণ তোমাকে কিছু বলিনি; তা বিলেতের ছেলে ব'লে কি তোমাকে ভয় ক'রে চলতে হবে? অত ভীতু নই আমরা! তোমার চেয়ে আমাদের বাংলা দেশের ছেলেরা ঢের ঢের ভাল!'

গোবর্ধন দাদার সঙ্গে যোগ দেয়,—'হ্যাঁ, স্পষ্ট কথা! আমরা ভয় খাই না! নিশ্চয় ভাল, হাজার হাজার গুণ ভাল! অত বোকা পাও নি আমাদের, যে যা খুশি তাই বুঝিয়ে দেবে! তিন হাজার বছরের বাসি মড়া চালাতে চাও আমাদের কাছে? টাটকা মড়া থাকে তো নিয়ে এস—টাটকা চমৎকার খাসা একখানা লাশ! গোঁফ দাড়ি সমেত তোফা! আমাদের আপত্তি নেই।'

তিনজনকে বাক্যহীন গুরুগম্ভীর মুখে ফিরতে দেখে পৃথ্বীশ রায় বিস্মিত হন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের আগেই হর্ষবর্ধনের বিচলিত কণ্ঠ শোনা যায়, 'মশাই, চলুন! আর নয়, এ দেশে আর এক মুহূর্ত না! এই আপনার বিলেত? দূর দূর! সারা শহরটায় দেখবার মত কিছু নেই! এর চেয়ে আমাদের কলকাতা ভালো! ঢের ঢের ভাল! হ্যাঁ, ঢের ঢের ভাল!

কার অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত কে জানে!
অবশেষে কি না—
অঙ্গ বা কলিঙ্গ নয়,
রঙ্গভরা বঙ্গদেশের রাজধানী
খোদ কলকাতা
শহর থেকেই
চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন!

সকালবেলায় খবরের কাগজের খানিকটা পড়েই বিচলিত হয়ে পড়েছে গোবর্ধন। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—ভারি মুস্কিল তো!

কেন, কি হলো আবার? সামান্যমাত্র কৌতূহল হর্ষবর্ধনের। ওঁর ভাইয়ের বিবেচনায় যা-মুস্কিল তাকে মুস্কিলের মধ্যেই তিনি গণ্য করেন না, বাতুলের প্রলাপের মতোই অকাতরে বাতিল করে দেন।

গোবর্ধন কিন্তু নিজের সমস্যাকে নগণ্য জ্ঞান করতে পারে না, দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলে—নাঃ টেঁকা দায় হলো কলকাতায়! যা মুস্কিল দেখছি—

আবার সেই এক কথা—সেই বারম্বার বলার বাহুল্য! বিনা বাক্যব্যয়ে গোবরাকে একটা কিল কসিয়ে দেবার প্রেরণা হয় হর্ষবর্ধনের! তিনি আত্মসম্বরণ করে নেন—কিসের মুস্কিল, শুনি?

যা দেখছি খবর আজকের—গোবর্ধন মুখখানাকে হাঁড়িপানা করে আনে। দাদার অটলতাকে আমলই দেয় না সে।

আরে, খবর তো আমিও দেখছি! হর্ষবর্ধন তাঁর মনের বিকার মুখের কথায় এবং মাংসপেশীতে পরিস্ফুট করেন—দেখছি না কি? কিন্তু কোন্ খবরটা? মুস্কিল বাধলো কিসে?

বাস্তবিক, খবরের কাগজ তো তিনিও পড়ছেন, অনেক খবরই পড়ে ফেলেছেন এতোক্ষণে—কিন্তু মুস্কিলজনক কোনো দুসংবাদের কিছুই তো খুঁজে পান নি এখন পর্যন্ত।

প্রাতঃকালে আনন্দবাজারের প্রাদুর্ভাব হতেই, প্রথমেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন হর্ষবর্ধন, কাগজের প্রধান প্রধান প্রত্যঙ্গগুলি তিনিই আত্মসাৎ করে নেন আগে থেকে। আসল সার খবর এবং জ্ঞাতব্য যা-কিছু সবই রাখেন নিজের দখলে, কেবল খবরের ছিবড়েগুলো যাতে থাকে সেই জবড়জং পাতাগুলো ফেলে দেন গোবরাকে।

গোড়া থেকে সোজা ডগায় চলে যাওয়া, যেমন করে লোক গাছে ওঠে, হর্ষবর্ধনের কাগজ পড়ার সেই নিয়ম। কাগজকে পেড়ে ফেলে তার আগাপাশতলা তিনি পড়ে ফেলেন, দরকার হলে তার ওপরে শুয়ে পড়েও—হ্যাঁ—এবং—কোথ্থাও তার বাদ রাখেন না।

প্রথম পাতার প্রথম লাইন—অতিকায় অক্ষরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে তাঁর পাঠ শুরু হয়—তারপর, দৈনিক নীট বিক্রয় সংখ্যা এক লাখ

ছিয়াত্তর হাজার, এই অভ্রভেদী তথ্যকে গোগ্রাসে গিলে, দক্ষিণের ভট্টাচার্য মহাশয়ের চা-পানের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং বামের একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতার বিনামূল্যে ক্যাটালগ প্রদানের আবেদন অগ্রাহ্য করে, এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া এবং ক্যালকাটা ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক লিঃ প্রভৃতি অবলীলাক্রমে পেরিয়ে' একেবারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রশংসিত গৌর-মার্কা খাঁটি সরিষার তৈলে এসে পড়েন। তারপর সেখান থেকে, স্বভাবতই, তিনি পিছলে পিছলে চলে যান সংবাদের বিভিন্ন প্রদেশে—শ্রীরামপুরের বঙ্গেশ্বরী কটন্ মিল, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল কেমিকেলের লাইমজুস্ য়্যাণ্ড গ্লিসারিন কিছুই তাঁর বাদ যায় না। কোন মূল্যবান খবরই ফসকাবার উপায় নেই তার খপ্পর থেকে। সর্বত্রই সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি এমন কি কর্মখালির খুঁটিনাটিতে পর্যন্ত তাঁর সমান খর নজর।

কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে কি কি সুবিধা, কোন্ বীমা কোম্পানীর মেয়াদী বীমায় জেয়াদা লাভ, কোথায় নামমাত্র প্রিমিয়ম দিয়ে, একবার মরতে পারলেই হাতে-নাতে স্বর্গ, তারপর জীবন-ধারণ না করলেও চলে, এমনকি কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে থাকাটাই অবাঞ্ছনীয়—কোনখানে জীবন-বীমা করে, কোনো প্রকারে গতাসু হলেই আশু বড়োলোক! সেই সব কাহিনী একে একে তিনি পড়েন। গল্পচ্ছলেই পড়েন এবং অকপটে বিশ্বাস করেন। এবং এক এক সময়ে দুর্দমনীয় লোভ হতে থাকে তাঁর—য়্যা, একটা প্রিমিয়ম দিয়ে দেখলে হয় না? তারপরে যদি কোনো গতিকে—?

হ্যাঁ, অতিকষ্টেই মারা পড়বার প্রলোভন সম্বরণ করতে হয়েছে তাঁকে কতোবার।

তারপর তাঁর 'পাত্র চাই, পাত্রী চাই' প্রভৃতি গলাধঃকরণের পালা। এইসব রোমাঞ্চকর ঘটনা—কিম্বা দুর্ঘটনা, যাই বলো, সব আগে উদরস্থ করার সাধ হয়, রোজই—দুর্বার বাসনাই জাগে বলতে গেলে, কিন্তু প্রাণপদ-বলেই নিজেকে তিনি চেপে রাখেন। নিখুঁত রকমের নিরপেক্ষ লোক তিনি, সব খবরের প্রতিই তাঁর সমান অনাশক্তি! কোনো বিশেষ ইত্যাদির দিকেই ইতরবিশেষ হয়ে পড়বার লোক তিনি নন। খবরের কাগজ পড়েন, যেমন পড়ার নিয়ম, একের পর এক, ওপর থেকে নীচে-বরাবর, ডাইনে-বাঁয়ে বিনা-দৃকপাতে, লাইনের পর লাইন—একেবারে বদ্ধপরিকর হয়ে। চিরদিনের এই বদভ্যাস। ডিরেল্ড হবার পাত্র তিনি আদপেই নন।

আসল আসল খবরগুলো দাদাই সব সারেন, বাধ্য হয়ে গোবরাকে বাজে খবর নিয়েই পড়ে থাকতে হয়। বড়ো বড়ো, মেজো মেজো, ছোটো

ছোটো হরফে যতো বিলিতি ব্যাপার—কিছুই জানবার কথা নেই তার মধ্যে, আর জানলেই—বুঝবার যো কী! একটা কান্ডও যদি তার বোঝা যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা—তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি, কষ্ট করে কে তা পড়ে? গোবরার তো অষ্ট রম্ভা! তারপর মিশরে ভীষণ সোরগোল, জার্মানীতে ইহুদিদের প্রতি অত্যাচার, প্যালেষ্টাইনে আরবদের তান্ডবলীলা—এসবের মাথামুন্ডুও যদি কিছু বোঝা যায়! এর ওপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর পরিস্থিতি—পরিস্থিতি আবার কি রে বাবা? এবার একেবারেই পিলে চমকে যায় গোবরার।

এই সব খবরই পড়তে হয় গোবরাকে, বাধ্য হয়ে, বিরক্তির সঙ্গেই। দাদার হাস্য-বিকশিত বদন দেখে, আর কাগজের যে সব পাতা দাদার বেহাতে, সেদিকে লোলুপ নেত্রপাত করে কেবল। কিন্তু নাঃ, এতোক্ষণে—এবং এতদিনে—একটা চমৎকার খবর পেয়েছে সে। স্বহস্তেই পেয়েছে। পড়বার মত খবর—জবর খবরই বটে—পড়লেই বোঝা যায়, আর বুঝলেই বুক কাঁপতে থাকে গুর গুর করে।

হর্ষবর্ধন সবেমাত্র বায়স্কোপের পাতায় এসে পেশছেছেন, ছবির বিজ্ঞাপন দেখেই তাঁর সিনেমা দেখার কাজ সারা হয়—একবার সেই যা বাইশজনের কোপে তিনি পড়েছিলেন, সেই ঢের, আর বাইশকোপের শখ তাঁর নেই। এই সচিত্র সংবাদগুলো খুব সযত্নেই পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি পড়েন; পড়ছেন আর এমন সময়ে কোন রকমে হৃৎকম্প স্থগিত রেখে, দুসংবাদটি ব্যক্ত করে ফেলেছে গোবর্ধন।

ভারী ভাবনার কথা, বাস্তবিক। তবু ঘাবড়ায় না গোবরা।

হ্যাঁ, আমিও ভেবেছি—হর্ষবর্ধন হঠাৎ বুঝতে পারেন যেন—অনেকদিনই ভেবেছি। কিন্তু এতোবড়ো কলকাতা শহর, তাতে আর আশ্চর্য কি!

বাঃ, কলকাতা বলে কি এমনিই হবে? গোবরার আশ্চর্যই লাগে—এতোটাই হবে? উঠে পড়ে পায়চারী করতে শুরু করে দেয় সে নিদারুণ উত্তেজনায়।

হবে না কেন? বাড়ি ঘর কি কিছু কম আছে কলকাতায়!

আবার রোজই বাড়ছে কতো? বেড়েই তো যাচ্ছে রোজ রোজ।

বাড়ি-ঘর বেশি বলে কি ছেলেদেরও বাড়তি হয়েছে নাকি?

গোবর্ধন বিস্ময়ে বিচলিত। আঁটছে না নাকি বাড়িতে—তুমি বলছো কি দাদা?

তা লাগে বই কি এতো ইঁট। এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার আর বেশি কি এমন?

ইঁট?—গোবর্ধন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, অতো। হাজার ইঁটের একখানা যেন ছিটকে এসে লাগে তার মাথায়—ইঁট কোথায় পাচ্ছো তুমি?

কেন, এই তো? ছেপেই দিয়েছে তো! প্রথম পৃষ্ঠার প্রথমতম সংবাদের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করেন তিনি। এই তো এখানে—লিখছে নীট বিক্রয় সংখ্যা এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার। আর আর—পুনশ্চ তিনি প্রাঞ্জল করে দেন—আর নীটও যা ইঁটও তাই!

বিস্ময়ের ধাক্কায় গোবরা চুপ মেরে যায়। বলৎশক্তি লোপ পায় বেচারার।

তা লাগবে না! বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে কম কি? রোজই তো তৈরি হচ্ছে। হর্ষবর্ধন নিজেই প্রকাশ করেন। একখানা বাড়িতেই তো লেগে যায় কতো হাজার। কাঠই লাগে কতো।

নীটের কথা কে বলছে। ধীরে ধীরে বাক্যস্ফূর্তি হতে থাকে গোবরার।

আহা নীট কেন—ইঁট। হর্ষবর্ধন নিজেই প্রুফ সংশোধন করেন—নীট আবার কী? তা কি বিক্রি হয় বাজারে? কেউ কি নীটের নাম শুনেছে কখনো? না, চোখে দেখেছে? ওটা হবে গিয়ে ইঁট। কলকাতার লোকের দশাই ঐ। ওরা আমকে বলে আঁব আর শিয়ালদহকে বলে শেয়াল-দা! ওদের উচ্চারণই ঐ রকম! দাদা বলে ডাকে ইষ্টিশনকে, হা-হা!

আমি কি ইঁটের কথা ভাবছি নাকি?—গোবরা দ্বিরুক্তি করে বসে।

কাঠের কথাই তো? হ্যাঁ, ভেবেছি আমিও। কিন্তু দৈনিক কাঠ বিক্রয়ের সংখ্যা কি ছাপবে ওরা? তা হলে তো আমাদের কাঠের ব্যবসা আরো কতো ফলাও হতে পারে। কাঠও কিছু অদরকারী নয়, বিক্রয়ও কম হয় না, অন্ততঃ, ইঁটের চেয়ে কম নয় নেহাৎ, কিন্তু বলে কে!

ধুত্তোর কাঠ!!

গোবর্ধন আর চুপ থাকতে পারে না, কাঠ না তোমার মাথা!

এবার রাগ হয়ে যায় হর্ষবর্ধনের। ইঁটে না হবি না হ, কিন্তু কাঠের কথাতেও দ্রবীভূত হয় না এমন অনুভূতিহীন ব্যক্তির হৃদয়দ্বারে—উঁহু একেবারেইই তা নিরর্থক, হয়তো অস্তিস্তই নেই হৃদয়ের—না, নিতান্তই তার পিঠের দিকের চৌকাঠে কিম্বা কানের দোরগোড়াতে প্রচণ্ড একটা করঘাতের প্রবল বাসনা তাঁর অভ্যন্তরে নিদারুণভাবে জাগর্তে থাকে। অন্তর্গত ইচ্ছাটাকে প্রায় হস্তগত করে এসেছেন এমন সময়ে বাধা আসে গোবর্ধনের তরফ থেকে—আমি বলছি অন্য খবর। ভারি উপদ্রব যে কলকাতায়!

উপদ্রব!! কিসের উপদ্রব? হর্ষবর্ধন হকচকান—ভূতের উপদ্রব নাকি? অল্প বিস্তর ভয়ই হতে থাকে তাঁর, হবেই তো ; হওয়া স্বাভাবিক। উপদ্রব মানেই ভৌতিক, তা ছাড়া আর উৎপাত করবে কে? কার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? অতো দুষ্টু বুদ্ধি আর আছে কার মাথায়? তাঁর ধারণায়, ভূত আর উপদ্রব ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

ভূত নয় তো? নীট ছুঁড়ছে নাকি?

নীট পাটকেল ওরফে ইঁট-পাটকেল, ভুতেরাই ছুঁড়ে থাকে কেবল। হর্ষবর্ধনের মতে (এবং অনেকের সাক্ষ্য আছে তাঁর সপক্ষে) নীট ছোড়া কর্ম হচ্ছে ভূতদের এবং কখনো কখনো রাজমিস্ত্রীর। কিরকম যেন বদভ্যাস ওদের! তা বাদে, পাগলারাও অবশ্য যোগ দেয় সেই সঙ্গে—কিন্তু সে ভয়ানক কদাচ।

কোথায় বেধেছে হাঙ্গাম? ভয়ে-ভয়েই তিনি জিগ্যেস করেন। আশে-পাশেই নয়তো রে? এখন থেকেই বুকের গুরগুরুনি শুরু হয়ে যায় তাঁর।

উঁহু, ভূত নয়। ছেলেধরার উপদ্রব! গোবর্ধন বেফাঁস করে।

ছেলেধরার—তাই বল! হালে পানি পান হর্ষবর্ধন। ছেলেধরার উপদ্রব তো কী হয়েছে! ভয়ের কী আছে তাতে? হেসেই ফেলেন তিনি। অম্লানবদনে হাসেন।

একদল বিদঘুটে লোক এসেছে কলকাতায়, ছেলেদের ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম্ করে রাখছে, তারপরে বিস্তর টাকা আদায় করে ছেড়ে দিচ্ছে তাদের। বহুত ছেলে ধরে নিয়ে গেছে এই ক-দিনে। গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

ছেলে ধরছে তো আমাদের কি! হর্ষবর্ধনের ইচ্ছে হয় এক্ষুনি গোবরাকে ধরে তিনি গুম্ করে দেন—সশব্দে তার অপর পৃষ্ঠে—অবারিত পৃষ্ঠদেশে—তার বোকামির পরাকাষ্ঠায়! আমাদের কি তাতে? আমরা কি ছেলে নাকি?

কেন, আমাদের কি ধরতে নেই? যার কাছে টাকা পাবে, তাকেই ধরছে যে! তোমারও টাকা আছে, তোমাকেও—

আমি কি ছেলে, শুনি আগে? অন্যায় দোষারোপে তাঁর গা-জ্বালা করে, উষ্ণ কণ্ঠেই তিনি বলেন—ছেলে কি আমি?

তবে কি—তবে কি—আমতা আমতা করে, তবে কি, তুমি মেয়ে?

মেয়ে আমি? পাগল! গোবরার অমূলক সন্দেহ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, নিজের পরিপুষ্ট গোঁফের দুই প্রান্তে তিনি হস্তক্ষেপ করেন, তোর গোঁফ কই এমন? আমি? আমি যদি মেয়ে হই তুই মেয়ের অধম—মেয়েরও নিচে। তুই তবে নাতনি!

কিন্তু ছেলেও না, মেয়েও না, তুমি তবে কী? গোবর্ধন তাকে কোণ-ঠাসা করে ফেলে।

হর্ষবর্ধন ভাবিত হন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব তিনি ব্যক্ত করতে পারেন না; ভাবনায় যদি বা কূল পান, ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারেন না—তিনি যে কী, যদি বা নিজে কোনো রকমে জানা যায়, জানানো যায় না তা

কিছুতেই। প্রকাশের অক্ষমতায়, অগত্যা, বিশ্বস্রষ্টার মতোই নিজের সম্বন্ধে তাঁকে মৌন থেকে যেতে হয় অবশেষে।

কিন্তু মৌনতা আর কতোক্ষণ? অসম্মতির ক্ষেত্রে কাঁহাতক আর মৌনতা বজায় রাখা যায়? ক্রমশঃই তাঁর মাথা ঘুরতে থাকে!

গোঁফকে পরিত্যাগ করে গালে হাত দেন হর্ষবধন। এ যে আমূল তাঁর অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি! ভাবনার কথা, এমন কি দুর্ভাবনার কথাই। দাড়ি চুলকোতে থাকেন তিনি। মেয়ে আমি নই—কিছুতেই না! তোর কি মনে হয় যে আমি মেয়েছেলে! য়্যাঁ?

আমি তো ধারণাই করতে পারি না। গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

নিশ্চয়ই না। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। জোরের সঙ্গেই জাহির করেন তিনি। আমার অটল বিশ্বাস যে আমি মেয়ে নই। তবে এও সঠিক যে ছেলেও আমি নই। এতোখানি বয়স হয়ে গেলো, এখনও কি ছেলেই রয়েছি? আশ্চর্য!

বিস্ময়-প্রকাশের জন্য এর বেশি বাক্য হয় না তাঁর।

আমি কি বলেছি যে তুমি কাঁচ ছেলে? গোবরার পালটা প্রশ্ন।

ছেলেই নই তো, তার কাঁচই কি আর কাঁচাই কি? তবে হ্যাঁ, ছেলের দাদা বলতে পারিস বটে। এবার তিনি অকুতোভয়েই গোঁফকে হস্তগত করেন—অবলীলাক্রমে পাক দিতে থাকেন পুনরায়।

তার মানে, বাইশ বছর বয়স হয়ে গেলো, এখনো গোঁফ বেরুলো না তোর? কতো ছেলেরই বেরিয়ে যায় এর চেয়ে ঢের ছোটোতেই। হ্যাঁ! তুই একটা ছেলেরও অধম! তোকে মেয়ের মধ্যেও গণ্য করা যায় না। গোবরাকে একটা নাতিনির মতোই মনে হতে থাকে তাঁর। কিম্বা তাও মনে হয় না।

নিজে কী, তাই ঠিক করতে পারছেন না—হুঃ—। গোবরা গজরায়, ভারি আমার ছেলের দাদা এসেছেন! ভারি!

ভালো করে গোঁফ কামা দুবেলা—হর্ষবর্ধন সদুপদেশ দেন—তবে যদি পদবাচ্য হতে পারিস। এখনো তুই নিতান্তই বালক। আস্ত একটা দুগ্ধপোষ্য। হাসি ধরেনা হর্ষবর্ধনের।

আমি—আমি—আমি বালক? গোবরার রাগ হতে থাকে।

আহা, বালক যদি নাই হতে চাস, নাবালক তো নিশ্চয়? তাতে তো আর ভুল নেই? দাদু-সুলভ সান্ত্বনার স্বর তাঁর কণ্ঠে।

তুমি তাহলে, তুমি তাহলে—দাদার উপযুক্ত যথোচিত একটা বিশেষণ—তাতে অর্থই হোক অনর্থই হোক—খুঁজে বার করার চেষ্টা করে গোবরা—তুমি তাহলে আস্ত একটা মূঢ়মতি!

ঠিক এমনি সময়ে দরজা ঠেলে অপরিচিত একজন প্রবেশ করে, যার

বালকত্ব সম্বন্ধে দু'ভাইয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা অতি বিরল।

কাকে চাও হে ছোকরা? হর্ষবর্ধনের তলব হয়।

ঘরে ঢুকেই থতমত খেয়ে যায় ছেলেটা, থমকে যায়, কেন—আপনাদেরই। আপনাদেরকেই বোধ হয়। থেমে থেমে বলে।

আমাদের? হর্ষবর্ধন অবাক—আমরা তো চিনি না তোমাকে?

চিনবেন। ক্রমশঃ চিনতে পারবেন।

নাম কি তোমার? গোবরার জেরা চলে!

বিটকেলদের বাঁটকুল! সহজ সুরেই জবাব আসে।

গোবরাকে ধাক্কা মারে যেন। বাব্বাঃ, কী বিদঘুটে নাম!

কী মতলবে আসা, জানতে পারি? হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

আলাপ করতে এলাম। ছেলেটি বলে—আসতে কি নেই?

না, না তা কেন? হর্ষবর্ধন ঈষৎ অপ্রস্তুত হন—আসবে বই কি? হাজার বার আসবে। তা—তোমরা বুঝি পাশের বাড়ির?

প্রায় পাশাপাশি বই কি! আপনারাই কি আসাম থেকে এসেছেন? আসামের জঙ্গল থেকে?

হ্যাঁ, সেখানে আমাদের কাঠের ব্যবসা। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে জানান।

গোবর্ধনেরও হৃদয়ে আঘাত লাগে, জঙ্গল থেকে বটে, তবে জংলি নই। কলকাতার মানুষের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নই আমরা।

তাইতো শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ ঢুকে হকচকিয়ে গেছলাম। ছেলেটি প্রকাশ করে—দেখে তো বড়লোক বলে মনে হয় না আপনাদের। বড়োমানুষির কিছু নেই।

বড়োলোক নিয়ে তো কথা হচ্ছিলো না, কথা হচ্ছিলো বড়ো বালক নিয়ে—হর্ষবর্ধন প্রাঞ্জল করতে চান—এই গোবরাটা আমাদের ভারি নাবালক এখনো।

তুমি থামো দাদা! ফোঁস করে ওঠে গোবর্ধন। আসল বালকের সম্মুখে নাবালক বিবেচিত হয়ে নিজেকে ভেজাল প্রমাণিত করতে সে নারাজ।

ওঁদের ব্যক্তিগত সমস্যায় বাঁটকুল কর্ণপাত করে না। বলে, আপনাদের কি খুব টাকা? শুনেছি কিনা, জিগ্যেস করছি তাই।

তা টাকা আমাদের অগাধ। হর্ষবর্ধন বলেন অবহেলার সঙ্গে।

অঢেল—অঢেল! কথাবার্তার মোড় ঘোরাতে খুশিই হয় গোবরা—টাকা আমরা ঢেলার মতোই মনে করি।

বাঁটকুলের দু'চোখ টোপা কুলের মতো হয়ে ওঠে—টা—কা?

তা হবে না? জায়গাটা যে আসাম। হর্ষবর্ধনের জিজ্ঞাস্য হয় হঠাৎ—আর, টাকাকে ইংরেজিতে কী বলে শুনি? কী বলে হে?

আকস্মিকভাবে প্রশ্নপত্রের সম্মুখীন হয়ে ভড়কে যায় বাঁটকুল। ভয়ে ভয়ে বলে, মণি? মণিই তো?

মণি? মণি কেন? একি সাপের মাথার, যে মণি? মানুষের মাথা খেলিয়ে তবে আসে টাকা। টাকার ইংরাজি জানো না? সাম অব রুপিজ—! কতো রসিদই সই করে দিলাম ওই বলে। রিসিভড্ দি সাম অব রুপিজ—

সাম অব রুপিজ, তা কী হয়েছে? গোবরাও ঠিক বুঝতে পারে না দাদার বক্তব্য। অনর্থক অর্থনৈতিক আলোচনা একান্ত বিড়ম্বনা বলেই তার বোধ হয়।

এ সাম অব রুপিজ থেকে এলো আসাম অব রুপিজ! হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন—আসাম হলো গে টাকার জায়গা। অর্থাৎ কিনা—!

আপনারা বহুত টাকা জমিয়েছেন তাহলে? বাঁটকুল বলে।

আমরা কি আর জমিয়েছি! এমনিতেই জমে গেছে। জায়গাটাই ভারি জমাটি। হর্ষবর্ধন জানান।

ওখানকার মাটির দোষ! গোবরার বদনেও বিরক্তির ব্যঞ্জনা।

জল যেমন জমে যায়, আপনা থেকেই, তেমনি টাকা জমে আসামে। হর্ষবর্ধন দুঃখ করেন—না জমিয়ে নিস্তার কি ভাই!

জমাতেই হবে, উপায় নেই! মহা মুস্কিল! হাল ছেড়ে দিয়ে গোবরা হতাশ একদম।

আপনা-আপনিই জমে যায় টাকা? ভাবতে গিয়ে বাঁটকুলও নাজেহাল হয়ে পড়ে।

এই ধরো, এই রকমে—জমনীয়তার রহস্যকে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত করেন তিনি—জলে এসে জল বাধে, তার ওপরে ঠান্ডা পড়ে, অমনি জল জমে বরফ! কেমন কিনা! তেমনি টাকায় এসে টাকা বাধে, তার ওপরে ছাতা পড়ে, অমনি টাকা জমে—টাকা জমে—? উপযোগী শব্দের জন্য তিনি উপযুক্ত ভ্রাতার মুখের দিকে তাকান।

টাকা জমে পাহাড়! কথা যোগাতে দেরি হয় না গোবরার!

পা—হা—ড়! য়্যা—তো—টা—কা! বিস্ময়ে হাঁ বুজতে চায় না বাঁটকুলের!

তা পাহাড় বই কি! পাহারা দিতে হয় না—কেউ নিয়ে পালাবে, সে ভয় নেই। পাহাড়ই বলতে হবে—ছোটোখাটো পাহাড় কিম্বা পাহাড়ের অপভ্রংশ।

খরচ হবার যো কি! গোবরা বলে—খরচ করা সহজ নয় অতো!

একটা চোর ছ্যাঁচোড় নেই সেখানে যে নিয়ে পালাবে। হর্ষবর্ধন বেজায় ক্ষুব্ধ।

গরীব ভিখিরি নেই যে নিয়ে পস্তাবে! গোবরাও ভারি বেজার।

তা হলে ঠিক জায়গাতেই পেঁচেছি। বলে বাঁটকুল, প্রথমে ভেবেছিলাম যে ভুল ঠিকানা! ভালো কথা, আপনাদের কাছে রিভলবার আছে?

রিভলবার! সে আবার কী?

এই পিস্তল বলে যাকে?

নাঃ, নেই! হর্ষবর্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—কি হবে তা দিয়ে?

বন্দুক—টন্দুক?

বন্দুক কেন থাকবে? বিস্মিত হন তিনি—ও কি কাছে রাখবার জিনিস? ওর থেকে গুলি বেরিয়ে যায় যে! জানো না!

আমরা তো আর গুলিখোর নই? গোবরা বলে, যে রাখতে যাবো ও-সব।

ছোরা-টোরা? তাও নেই নাকি?

এতোক্ষণে গোবরার যেন কেমন ঠেকে—সন্দেহের ছায়াপাত হয়। এমন কি লাট হে তুমি যে এতো কৈফিয়ৎ দিতে যাবো তোমায়?

লাট নই সত্যি, তবে অনেককে লাট বানিয়ে দিই বটে! মুচকি হেসে বলে বাঁটকুল।

তোমরা লাট বানাও? বটে? গোবরা মুখ বেঁকায়—একদম বাজে কথা। আমি বিশ্বেস করি না।

বললেই হলো! বিলেত থেকে আমদানি হয় লাট! হর্ষবর্ধন সায় দেন—হ্যাঁ, লাট আর কারুকে বানাতে হয় না এখানে।

লাট কি চারটিখানি? গোবরা পুনশ্চ যোগ করে—বানিয়ে দিলেই হলো!

বলুন না কেন, আপনাকেই বানিয়ে দেবো এক্ষুণি। বাঁটকুলেরও জোরালো জবাব—আকচারই বানাচ্ছি কতো!

আকচারই বানাচ্ছো! বটে!

হর্ষবর্ধনের হয়তো একটু বিশ্বাসই হয় এবার, ঈষৎ প্রলুব্ধই তিনি হন—লাট করা তো সোজা নয় যে—কী করে করবে শুনি?

মেরেই লাট করে দেবো। ছেলেটি বলে—হতে চান আপনি? বলুন তা হলে।

হর্ষবর্ধনের উৎসাহ হয় না। হাত-পা ভেঙে অপদস্থ হয়ে উচ্চপদস্থ হবার উচ্চাকাঙ্খা তাঁর নেই, অন্ততঃ ততোটা তীব্রভাবে নেই। তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। গোবরাও ঘাড় নাড়ে। চাকরি পাবার আগেই সে রিজাইন দিয়ে দেয়।

তবে যা যা জিগ্যেস করি, ভালো ছেলের মতো জবাব দিন তা হলে? বুঝলেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, টেলিফোন আছে এই বাড়িতে? নেই, ভালো

কথা। বেশ, তবে এই চিঠিটা নিন আপনাদের।

বাঁটকুল একটা চিঠি বাড়িয়ে দেয়।

এবার গোবরার সন্দেহ হর্ষবর্ধনের অন্তরেও সঞ্চারিত হয়—একই সংক্রামক আশঙ্কা দু'জনের মনেই ঘনীভূত হতে থাকে। লাট হবার বা ঐ জাতীয় ভয়াবহ কিছু হবার আমন্ত্রণপত্র নয় তো! কম্পিত হস্তে তিনি খাম খোলেন।

চিঠির মর্ম ভারি মর্মন্তুদ—পড়ে মর্ম ভেদ করে মুখ শুকিয়ে যায় হর্ষবর্ধনের। কয়েকটি আঁচড়ে জানানো হয়েছে—

"পত্রপাঠমাত্র পত্রবাহকের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা গুণে দেবেন। নতুবা আপনাকে পাকড়ে ধরে এনে আমাদের আটকঘরে আটকে রেখে দেবো, যদ্দিন না আদায় হবে টাকাটা।।" ইতি—

শ্রীবিটকেল সম্রাট।

নাঃ, লাট করবার ষড়যন্ত্র নয় বটে, কিন্তু তার চেয়েও কিছু কম শোচনীয় নয়। গোবরার হাতে তিনি এগিয়ে দেন সম্রাটের চিঠিটা। গোবর্ধন পড়ে গম্ভীর হয়ে যায়—তখন যা বলছিলাম দাদা!

আজকের আনন্দবাজারের—সেই নিরানন্দকর সংবাদের সঙ্গে যে এর ঘোরতর সংস্রব আছে বলবার আগেই তা টের পেয়েছেন হর্ষবর্ধন। তিনি শুধু বলেন, টাকা দিয়ে পাপ চুকিয়ে দাও। কাজ নেই হাঙ্গামে।

কিন্তু ছেলেটা গেলো কোথা? এঘর-ওঘর, ওপর-নিচে, চারিধার খোঁজা হলো, পাত্তাই নেই। দলবল ডেকে আনতে গেলো নাকি?

হর্ষবর্ধনের বুক দুরু দুরু করে—ছেলেধরারা এসে পেঁছোবার আগেই, বুঝেছিস গোবরা—বিদূরিত হবার বাসনা জাগতে থাকে তাঁর মনে—পালাই চ' এখান থেকে।

এক্ষুনি চলো দাদা। গোবরাও নিজেকে দূরীভূত করতে চায়—সুদূরে পালিয়ে যাই।

একবস্ত্রে দু'ভাই বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে। কাঁপতে কাঁপতে, কোনো-রকমে তালা আঁটে সদর দরজায়। তারপর ফুটপাথে পদক্ষেপ করে।

কয়েক পা এগোতেই দেখা গেলো, প্রকাণ্ড একটা ধূসর রঙের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোবরা সেইদিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—হেঁটে হেঁটে আর কতোটা পালানো যাবে? চলো ওই মোটরে করে কেটে পড়ি।

হর্ষবর্ধন একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দেন ড্রাইভারের হাতে—এখান থেকে পালিয়ে চলো। নিয়ে চলো আমাদের যেখানে ইচ্ছে, যেদেশে ইচ্ছে, যতোদূরে ইচ্ছে—এই নাও তোমার ভাড়া—এই একশো টাকা। একশো মাইল গিয়ে তবে থামবে। বুঝেছো?

বাবাঃ! এ ছেলে-ধরার দেশে আর না! গোবরা বলে, কলকাতায় থাকে মানুষ? হ্যা! কখনো আসতে আছে এখানে? দূর্ দূর্।

ষ্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে চালু করেই ড্রাইভারের প্রশ্ন হয়—কোন্ দিকে যাবো, মশাই?

যেদিকে খুশি! বৈরাগী-বিমুখ জবাব বড়ো দাদার—যেদিকে তোমার মোটর যায়।

চালাও দিগ্বিদিকে। ছোটো ভাইয়েরও হাল ছেড়ে দেবার বিলাসিতা! বলে, কলকাতা ছেড়ে যেদিকে দিল্ চায় তোমার।

ইটালির দিকে যাবো কি? ড্রাইভারের পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য।

ইটালি! আকাশ থেকে পড়েন হর্ষবর্ধন—মোটরে চড়েও যাওয়া যায় না কি সেখানে? য়্যাঁ? এ বলে কি রে, গোবরা।

কিন্তু ড্রাইভারের মুখে পরিহাসের কোনো লক্ষণ না দেখে তিনি নিজেকে সামলে নেন—হবেও বা! আমরা কিন্তু উড়োজাহাজে চেপেই গেছলুম যেন একবার! সে তো এখানে নয়, অনেক দূরে যে—প্রায় বিলেতের কাছেই বলতে গেলে!

আবার সেখানে যাবে নাকি দাদা?

আবার? পাগল হয়েছিস? ছ্যাঁ! আবার সেখানে যায় মানুষ! সেই ইটালিতে? দু'বার যায় এক জায়গায়? রামোঃ!

দু'বার যাওয়া গোবরারও মনঃপুত নয়—যদি এক জায়গার মধ্যেই বারম্বার ঘুরবে তাহলে ভগবান এত জায়গা সৃষ্টি করতে গেলেন কেন? এই সুবিস্তৃত ভৌগলিক উপন্যাস—এই লীলায়িত বিলাসিতা—কতো দেশ আর শহর, পাহাড় আর পাড়াগাঁ, অরণ্য আর লোকারণ্য, এসব তৈরি করতে তাঁকে তো কম বেগ পেতে হয়নি, কষ্টও করতে হয়েছে, দস্তুর মতোই! কেন না, গোবরার ধারণা (এমন কি তার গবেষণাও বলতে পারো) যে লোনা সমুদ্রগুলো অনেক সৃষ্টি এবং অনাসৃষ্টির মেহনতে হয়রান পরমেশ্বরের বিস্তর অশ্রুপাত ছাড়া আর কিছু না।

ইটালি ছাড়া আর কোথায় কি যেতে পারো না তুমি? এই ধরো—কিয়ৎক্ষণ মাথা ঘামাতেই ভূগোলের গোলমাল পরিষ্কার হয়ে আসে; গোবরার মনে পড়ে যায়—ডেনমার্ক?

পদ্মপুকুরেও যেতে পারি। গম্ভীর মুখে জবাব দেয় ড্রাইভার—কিম্বা বলেন তো বালিগঞ্জে, কি আর একটু এগিয়ে আলিপুরে—

ঈষৎ কিন্তু বিশদ বাঁকা হাসিই যেন দেখা যায় তার মুখে।

আহা, চালিয়ে চলো তো তুমি! দেখাই যাক না কদ্দুর যাওয়া যায়! হর্ষবর্ধন গন্তব্যসমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করে দেন এক কথায়। হ্যাঁ, দেখাই যাক না কোথায় যাই! গোবরাও উৎসাহ দেখায়—বিলেতেই যাই

কি খালেতেই যাই। একশো মাইলের ভাড়া তো দেওয়াই রয়েছে তোমার! ভয় কি?

কেবল ঐ লক্কড় ইটালিটা বাদ দিয়ো বাপু! নেহাৎ না পারো ওটার পাশ কাটিয়ে যেয়ো বরং! এবং হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—এবং তোমার ঐ আলিপুরটাও আমার খুব ভালো ঠেকছে না হে। নাম শুনেই সন্দেহ হচ্ছে কেমন!

গাড়ি চলতে থাকে। এ রাস্তা ঘুরে ও রাস্তায় বেঁকে সে রাস্তার ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে, কখনো ক্ষিপ্র বেগে, কখনো বা ধীর-মন্থর গমনে, বহুৎ য়্যাকসিডেন্ট থেকে বেঁচে এবং দেদার ধাক্কা বাঁচিয়ে চলতে থাকে গাড়ি। এনতার ঠোকাঠকির মুখোমুখি এগিয়ে, এমন কি অনিবার্য সামনে এসে কি করে যে সামলে নেয়; নিজে চুরমার না হয়ে এবং কাউকে বিচূর্ণিত না করে কি করে যে বেমালুম বেরিয়ে যায়—সেই এক রহস্য! ড্রাইভারের ওস্তাদি দেখে বাহবা দিতেই ইচ্ছে করে ওঁদের। এবং নিজেদের জোর বরাতকেও তারিফ করতে হয়। রুদ্ধ নিঃশ্বাসেই করতে হয়।

অবশেষে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায় গাড়ি। ট্রাম, ট্যাক্সি গরুর গাড়ি রিকশ লরি—সব সেখানে দাঁড়ানো। রাস্তা জাম। এতো ভিড় কেন রে বাপু এ রাস্তায়? এতো পথ পেরিয়ে এলেন—মোটরে চেপেও এতোখানি সবুর করতে হবে এমন কথা তো ছিলো না কোথাও!

রাস্তাটার নাম কি হে, ড্রাইভার?

স্ট্রান্ড রোড।

তখনি বুঝেছি আমি। হর্ষবর্ধন বলেন সহর্ষে—ইসট্যাণ্ডো—মানে জানিস তো গোবরা? ইসট্যাণ্ডো মানে দাঁড়ানো। না, ভুলে মেরে দিয়েছিস একেবারে?

জানি জানি! ভুলবো কেন? ইসট্যান্ড আপন দি বেঞ্চ। গোবরা যে ভুলে মেরে দেয়নি জোরালো গলা জাহির করে এবং আনুষঙ্গিক উদাহরণ যুগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সপ্রমাণ করে। বাস্তবিক ভোলবার কথা তো নয়! পড়াশুনায় যতোই কাঁচা হোক, ইসট্যাণ্ডের কথা যে ভোলা যায় না কিছুতেই। বরং কাঁচা হবার জন্যেই, আরো বেশি করেই স্মরণে আছে বিশেষ করে ঐটাই। কেবলমাত্র বইয়ের পড়া বলেই নয় ইতিহাসের বিষয়ও যে বটে ওটা—কতোবারই না উক্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে তাঁদের বাল্যজীবনে। তার স্মৃতি কি ভোলবার? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্বয়ং দৃষ্টান্তস্থল হয়ে যা শেখা যায় তা কি হজম করবার জিনিস?

সেইজন্যেই গাড়ি-ঘোড়া সব দাঁড়িয়ে। ইসট্যাণ্ডো রোড যে। হর্ষবর্ধনের অভিযোগ—এখানে দাঁড়াতেই হবে কি না! ইসট্যাণ্ডো রোড বলেছে কেন? অনির্বচনীয় তাঁর হাসি।

আর ঐ যে দূরে, দেখছো দাদা!—আন্দাজ করেই বলে গোবরা—ঐ হচ্ছে হাওড়ার পুল! নিশ্চয়ই তাই, তা ছাড়া আর কি হবে? তাছাড়া আর পুল আছে কি কলকাতায়। বইয়েও পড়া গেছে আর সনাতন খুড়োও বলেছিলো! হাওড়ার পুল জলে ভাসে, জানো তো দাদা?

গোবর্ধন যেন দাদার আবিষ্কৃত উক্ত দণ্ডায়মান রাস্তার চেয়েও বৃহত্তর পরমাশ্চর্যকে বহিষ্কার করে।

হর্ষবর্ধন গুম হয়ে যান। আপ্যায়িত হওয়া তাঁর পোষায় না। ইতিহাসেই কি আর ভূগোলেই কি, দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিদ্যা প্রকাশের বাহাদুরি, এইভাবে সব তাতেই দাদার ওপর টেক্কা মারবার দুশ্চেষ্টাকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। খুড়ো নয়, জ্যাঠা নয়, পিসে নয়, পিসশ্বশুরও না, সামান্যমাত্র একটা ভাই হয়ে অগ্রজকে এককাঠি ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সব সময়েই এই যে ওৎ পেতে থাকা—এটা তাঁর অত্যন্ত অশোভন মনে হয়। মিলিয়ে মিশিয়ে সমস্তটা বরদাস্ত করা কঠিনই হয় তাঁর পক্ষে। বেজায় রকম তিনি বেজার হন ; হাজার কৌতূহল থাকলেও, পুলের প্রতি ভুলেও দৃকপাত করেন না, ভ্রূক্ষেপই করেন না সেদিকে বলতে গেলে।

গাড়িও অচিরে মোড় ঘুরেছে এবং তিনিও, ভাসমান পরমহংসজাতীয়, দেব-দুর্লভ বস্তু দেখবার দুরভিসন্ধি অতিকষ্টে দমন করে ফেলেছেন ততোক্ষণে। গোবরার কথায় কান না দিয়ে ড্রাইভারকে তিনি জিগ্যেস করেন—আর এ-রাস্তাটার নাম?

হ্যারিসন রোড।

হ্যারিসন? সে আবার কি? এরকম অদ্ভুত নাম কেন? হর্ষবর্ধনের মাথা ঘুরে যায়। আমাদের বাড়ি রসা রোডে। রসা রোডের ওপরে নয় ঠিক, তবে সেই এলাকায়। তাহলেও একটা মানে হয় তার। অর্থাৎ কিনা রসায়ন রোড, সংক্ষেপে রসা। অর্থাৎ কিনা যতো রসিক লোকের বসবাস সেখানে। কিন্তু এ রাস্তার নাম এরকম বেধড়ক হ্যারিসন হতে গেলো কেন?

বড়োবাজার কিনা এখানে! ড্রাইভারের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

উঁহু, তা নয়। হর্ষবর্ধন স্বয়ং টিকা করেন—এটা হরি সেন রোড। হরি সেন হলো গিয়ে গৌরী সেনের ভায়রা ভাই। নামজাদা সেই গৌরী সেন, সেই যে উড়িয়ে—ফতুর লোকটা, সবাইকে টাকা নেবার জন্যে সাধা-সাধি করে বেড়াতো হে!

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, কথাতেই বলেছে! গোবর্ধন ভাষ্য করে—আমাদের সেই গৌরী সেন গো। ব্যাখ্যার ব্যাখ্যানায় বিলক্ষণ ওস্তাদ—সর্বদা তৎপর গোবর্ধন।

গৌরী সেন কোথায় থাকতো, কে জানে। কিন্তু পাছে টাকা নিতে

হয়, ভায়রা ভাই এসে জবরদস্তি করে সজোরে গছিয়ে দিয়ে যায় সেই ভয়ে হরি সেন বেচারিকে য়্যাদ্দুরে পালিয়ে এসে থাকতে হয়েছিলো।

হর্ষবর্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। ভয়াবহ টাকার জন্যে—তার ছোঁয়াচ বাঁচাতে, আত্মরক্ষার উপলক্ষে, কী না করে মানুষ?

ততোক্ষণে গাড়ি আরো খানিক এগিয়ে আরেকটা বাঁক নিয়েছে।

এটা কি রাস্তা?

আজ্ঞে, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট।

সেরেফ গোঁজামিল দিচ্ছো কেবল? য়্যাদ্দিন ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছো, রাস্তাঘাটের নামগুলোও ভালো করে জানো না বাপু! আওয়াজ শুনলেই তো টের পাওয়া যায়! বেশ বোঝা যায় যে এটা কর্ণওয়ালিশ নয়, কর্ণ-বালিশ। মহাভারতের কর্ণের বালিশ থাকতো এখানে।

কান-বালিশও তো হতে পারে দাদা। গোবর্ধনও নিশ্চেষ্ট থাকবার পাত্র নয়।

হ্যাঁ, তাও পারে। তাও হতে পারে বটে। তা হলে কিন্তু পাশ-বালিশও থাকবে। থাকতেই হবে। পাশবালিশের রাস্তাটা কোন ধারে তবে? ড্রাইভারের কাছেই তাঁর পথের দাবী।

বেচারি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে ভাবে, তারপর হতাশভাবে ঘাড় নাড়ে। ওই নামের কোনো রাস্তা চোখে পড়া দূরে থাক, তার কানের সীমান্তেও কখনো এসেছে কিনা সন্দেহ হয়।

আমরা যাচ্ছি কোনদিকে? গোবর্ধন জিগ্যেস করে। সামনের দিকটাতেই পাশবালিশের সম্ভাবনা রয়েছে তার আশঙ্কা!

শ্যামবাজারের দিকে।

তাহলে ঠিকই হয়েছে। কানবালিশ নয়, কর্ণবালিশই তবে হবে এটা। হর্ষবর্ধন উল্লসিত হন। এখানেই কর্ণ এবং সামনেই শ্যামচাঁদ—তারপর আরো খানিক এগোলেই যুধিষ্ঠির রোড ছাড়িয়ে কুরুক্ষেত্র পাবো নিশ্চয়ই। হর্ষবর্ধনের হর্ষ আরো বর্ধিত হয়।

আর এরই আশেপাশে—বুঝলে কিনা দাদা! প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় গোবরাই কি পেছোবার ছেলে? এরই আশেপাশে এধারে ওধারে আছে দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, ধনঞ্জয়, নল, নীল আর গয়-গবাক্ষ। একেবারে জলজ্যান্ত মহাভারতে এসে পড়া গেছে দাদা!

মহাভারতের কিসকিন্ধ্যা কাণ্ডে। যা বলেছিস ভাই!

নল তো চারধারেই। রাস্তার তলাতেও আবার! ড্রাইভার সায় না দিয়ে পারে না। এই যে বাড়ি-বাড়ি জলের কল, এসব জল আসছে কোত্থেকে বলুন তো! ঐ নল থেকেই সব। রাস্তার তলা দিয়ে নল। কিন্তু ফাটলে

কি আর রক্ষে আছে? একবার নল ফেটে কী জলটাই না জমেছিল রাস্তায়। এই রাস্তাতেই—আজ্ঞে!

বটে বটে? হর্ষবর্ধন একটু সন্ত্রস্ত। তা হলে গাড়ি ঘুরিয়ে নাও তুমি। কুরুক্ষেত্রের কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ডে গিয়ে আর তবে কাজ নেই। আমাদের লঙ্কাকাণ্ডই ভালো।

গাড়ি দিক পরিবর্তন করে। খানিক পরে ড্রাইভার নিজে থেকেই জানায়—এটা কলেজ ষ্ট্রীট।

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—কেন? লেজ কেন?

বলতে পারবো না মশাই। বলেই পরক্ষণেই তার টনক নড়ে। রামায়ণের হনুমানের সঙ্গে এই লেজের অঙ্গীভূত কোনো অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে কিনা, হর্ষবর্ধন সাগ্রহে এই প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন, এমন সময় ড্রাইভারের মনে পড়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিনা এই পাড়ায়! সেখান থেকে লেজ বিতরণ করে, বোধহয় সেইজন্যই!

ইনফ্যান্ট ক্লাসে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে ফিফ্থ ক্লাস অবধি পাঁচবার, ফোর্থক্লাসে তিনবার, থার্ডক্লাসে চারবার, সেকেণ্ডক্লাসে সাতবার এবং ফার্ষ্টক্লাসে আঠারোবার—সবসুদ্ধ, আদি থেকে ইতি পর্যন্ত ইত্যাদি জড়িয়ে, সাঁইত্রিশবার মোটমাট ফেল গিয়ে, শেষটায় নিজের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে অন্যায় রকমে ঘন ঘন প্রমোশন পেয়ে প্রায় ধরে ফেলে দেখে, অবশেষে, গোঁফে পাক ধরবার সঙ্গে, স্কুলে ইস্তাফা এবং ম্যাট্রিক পাশের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, সে ষ্টিয়ারিং হুইলের পাশে এসেছে। কাজেই ডিগ্রীধারীদের উপর খুব স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গতই বিরাগ ছিলো ড্রাইভারের। এমন কি, বিজাতীয় ক্রোধই বলা যেতে পারে তাকে। পাশ-করাদের আদৌ মানুষের মধ্যেই তার মনে হতো না, একেবারেই ধর্তব্যের বাইরে, নগণ্য এবং জঘন্য সে সব লোক, বাস্তবিক! আন্তরিক উষ্মা সে আর উহ্য রাখতে পারে না—মনের কথা ব্যক্ত করেই বসে!

বিশ্ববিদ্যালয় আবার কী বস্তু, তার সম্যক রহস্য অবগত হতে যাবেন, এমন সময়ে বেমক্কা আওয়াজে মোটরের একটা টায়ার ফেটে, গাড়ি থেমে যায় হঠাৎ। আচমকা পথের মধ্যে।

বোমা ফাটলো যেন! ভারি ঘাবড়ে যান হর্ষবর্ধন, কে ছুঁড়ল বোমা? ছেলেধরারা নাকি রে?

বেঁচে আছি তো দাদা? গোবরা নিজেকে চিম্‌টি কেটে দেখে। নিজেকে কাটতে গিয়ে দাদাকে চিমটি কেটে বসে।

উঃ কী করছিস! হর্ষবর্ধন উঁহু করে ওঠেন। চিমটি কাটছিস যে! চিমটে দিয়ে টিকে ধরে না? টিকে আছো কি না দেখছি তাই।

গোবরা জানায়—বোমা ফেটেছে বোধহয়।

বোমা না। পটকাও না! কিন্তু অনেক হাঙ্গামা! এই বলে মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন করে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামে।

টায়ার বদলানো বেশ কিছুক্ষণের ধাক্কা জেনে নিয়ে হর্ষবর্ধনও গাড়িতে তালাক দেন। গোবরাও নেমে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে বাবু হয়ে বসে থেকে গা জড়িয়ে এসেছিলো, কাবু হবার দাখিলই প্রায়—হাত পা এই অবসরে একটু খেলিয়ে নেওয়া দরকার।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে করে অরুচি ধরে যায় হর্ষবর্ধনের। হঠাৎ তিনি প্রস্তাব করে বসেন, জীবে দয়া করলে কেমন হয়? তাই করা যাক। আয়!

জীবে দয়া—তার মানে?

জীবে দয়া অর্থাৎ রসগোল্লা, সন্দেশ, মেঠাই, মণ্ডা, মতিচুর?

তা তো বুঝেছি। কিন্তু জীব কোথায়? গোবর্ধন চারিধার তাকিয়ে, সূচীভেদ্যভাবে দৃষ্টি চালিয়েও জীব-পদবাচ্য এবং দয়ার যোগ্য, একটা কাঙাল কি ভিখারি, সাধু কি সন্ন্যাসী, এমন কি লালায়িত একটা ছাগল কি গরু পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে না। একটা পরিশ্রান্ত পথভ্রান্ত, নেড়ি কুত্তাও চোখে পড়ে না!

দয়া যে করবে, তা জীব কই তোমার?

কেন, এই যে জীব! এইখানেই রয়েছে। মৃদুহাস্য করে বলেন হর্ষবর্ধন, যাবতীয় জীব এই আমার মুখের মধ্যে আছে।

হর্ষবর্ধন বদন ব্যাদান করে তার ভেতর থেকে বিচলিত জীবকে বাইরে আনেন, এটা কি জীব নয়? কী তবে শুনি এটা?

দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমান সব্যসাচীকে, স্বয়ং হাঁ করে যে প্রদর্শনী দেখিয়েছিলেন—সে যুগের ওয়ার্লড এগজিবিশন আর কি! এবং অর্জুনকেও হাঁ করিয়ে, এমন কি তাকে একেবারে থ' করে দিয়েছিলেন বলতে গেলে—তারই পুনরাভিনয় বা তেমনি রোমাঞ্চকর কোনো দৈবী-লীলা দেখতে পাবে, হয়তো এহেন প্রত্যাশা গোবরার ছিলো—কিন্তু যাবতীয় জীবের বদলে একমাত্র এবং একমাত্র কিম্ভূতকিমাকার ঐ বস্তু—এই দুর্ঘটনা দেখে কেবল ক্ষুণ্ণই নয় বিরক্তও হয় সে—ওঃ, এই জীব!

দাদার লেলিহান বাবা-কালী মূর্তিও তার ভালো লাগে না।

কিন্তু প্রস্তাবের কাছাকাছিই জীবে দয়ার ব্যবস্থা দেখলে কার না উৎসাহ হয়? লোভের সামনে ক্ষোভ আর কতোক্ষণ থাকে? মোটর বেগড়ানোর সামনেটাতেই জমকালো একটা সন্দেশের দোকান তাদের চোখে পড়ে।

এমন উপাদেয় জিনিস তারা কোথাও খায়নি—না নিজের দেশে, না কলকাতায়। জীবে দয়ার উপযুক্তই বটে! উল্লাসের আতিশয্যে গোবরা

উন্মুখর হয়ে ওঠে, বাঃ বাঃ! তোফা জিনিস তো! কেবল দয়া কেন, জীবে ভালোবাসাও বলতে পারা যায়, কি বলো দাদা?

হবে না? বলেন কি মশাই? ভীম নাগের যে! দোকানী জানাতে দ্বিধা করে না।

য়্যাঁ, ভীম—কি বললে? হর্ষবর্ধন তো লাফিয়ে উঠলেন।

ঐ দেখুন না, সাইনবোর্ডেই দেখতে পাবেন। এটা হচ্ছে আসল ভীমের দোকান। আর পাশেই ঐ তস্য ভ্রাতার।

তাইতো, সত্যিই তো! দু'ভায়ের তাক লেগে গেছে, চোখ উঠে গেছে কপালে। বহুক্ষণ বাদে হর্ষবর্ধন আগে সবাক হয়েছেন—দেখেছিস! ভীমার্জুন তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে কিন্তু তাদের দোকান রয়েছে এখনো। মহাভারতকে মিথ্যে বলবি আর? চোখের সামনেই জাজ্বল্যমান দেখ! পুনরপি বলছেন তিনি—তা ছাড়া এমন চমৎকার মেঠাই আর কার হবে বল? স্বয়ং ভীমের বের করা, আলবৎ! ভীম ছাড়া আর কারো কম্ম না, আমি হলপ করে বলতে পারি। বৃকোদর একটু পেটুক ছিলো, কে না জানে।

যেমন পেটুক ছিলো, তেমনি খেতেও পারতো খুব। হজমও করতো বেশ! তা পেটুক হওয়া কি দোষের? ছিলো বলেই তো বের করতে পেরেছিলো এসব! স্বর্গত ঔদরিকের প্রতি গোবর্ধন তার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে—পেটুক হওয়া ভালোই তো! তাতে ক্ষতিই বা কি? খেতে আর খাওয়াতে মজবুত লোকরা মন্দ কি এমন?

ততোক্ষণ মোটরটাকে দুরস্ত করে এনেছে ড্রাইভার। তার মাথাও অনেক সাফ হয়ে এসেছে। আরোহীদের এ-পর্যন্ত আলাপ-সালাপ অনুসরণ করে, বিশেষ করে অযাচিতভাবে জীব দয়া-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে অভাবিতভাবে ভীম নাগ উদরস্থ করার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে তার। তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সামনে, কুরুক্ষেত্র আর কলকাতা, রামায়ণ-মহাভারত এবং আনন্দবাজার-বসুমতী একাকার হয়ে দেখা দিয়েছে।

মোটর চলতে থাকে এবং সে বলতে থাকে—নিজে থেকেই বলে যায়—ভীমার্জুন-পাড়া ছাড়িয়ে এলাম তো! আর এই হচ্ছে আপনার ধর্মতলা! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আস্তানা ছিলো এখানে, বুঝেছেন? আর এখানটা চাঁদনি, অর্থাৎ কিনা চন্দ্রলোক, আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এ জায়গাটা এস্‌প্ল্যানেড, বোধহয় ইন্দ্রপ্রস্থ ছিলো এখানে।...আর এটা হলো গে' ডালহৌসি স্কোয়ার, ভারি কটমট নাম, কী ছিলো এখানে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক! হয়তো কিসকিন্ধ্যা হবে। এইবার চললুম ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়ে। ক্লাইভ কে ছিলো?

ড্রাইভারের প্রশ্নবাণে আহত হয়ে গোবরা দাদার দিকে তাকায়—কে ছিলো দাদা? ক্লাইভ কি জটায়ু পক্ষী?

উঁহু। ডালহৌসি আর ক্লাইভ এ দুটো বোধহয় মহাভারতের সেই দুটো বিচ্ছিরি লোক! হর্ষবর্ধনের ঈষৎ হাস্যই বেরোয়—আর কেউ না—হিড়িম্বা আর ঘটোৎকচ!

তাই হবে। বলে গোবরা—তাই হবে বুঝলে হে ড্রাইভার! কিন্তু বাপু, তোমাকে বললুম আমরা, কলকাতা থেকে আমাদের বার করে নিয়ে যেতে—একশো টাকা আগাম দিলুম নগদ—থোক, আর তুমি কিনা—কলকাতার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছো তখন থেকে। কেমন লোক হে তুমি? পঞ্চাশ মাইল তো এইখানেই কাটিয়ে দিলে! কুরুক্ষেত্রই বাধবে দেখছি শেষে!

এই যে মশাই! দেখতে পাচ্ছেন না সামনেই সেতুবন্ধ রামেশ্বর! এইটা পেরোলেই তো কলকাতার বার।

অপরিচিত হয়েও সুপরিচিত, পুরাতন অথচ চির নূতন, আদিম এবং অকৃত্রিম, অদ্বিতীয় সেই হাওড়ার পুলকেই সেতুবন্ধ বলে ভেজাল চালানোর চেষ্টায় হর্ষবর্ধনের রাগ হয়ে যায়—এই সেতুবন্ধ? কিচ্ছু জানো না তুমি। কলকাতায় সেতুবন্ধ! দূর দূর!

বোকা পেয়েছো আমাদের? গোবরাও খাপ্পা হয়ে ওঠে—জানি না কিছু আমরা? বটে?

কেন, থাকতে কি নেই কলকাতায়? ড্রাইভারের আত্মরক্ষার প্রয়াস—এতো জিনিস আছে যখন!

তোমার মুণ্ডু আছে! সেতুবন্ধ জলে ভাসতো, তা জানো?

এও তো তাই মশাই! ড্রাইভার এবার স্বপক্ষে একটা পয়েন্ট পায়। এও ভাসছে যে! তাকিয়ে দেখুন না নিচে!

ভাসতে পারে, কিন্তু সে সেতু বানিয়েছিলো বাঁদরে—গোবরা বলে, তুমি কি বলতে চাও যে, এও বাঁদরের তৈরি?

বাঁদর ছাড়া আর কি! এর পেছনে সব লেজওলা লোক ছিলো মশাই, আমি বলে দিতে পারি। ড্রাইভারের জোরালো কবুলতি—দিব্যি গেলেই বলতে পারি। হুঁ।

ড্রাইভার একসঙ্গে দুটো পয়েন্ট জেতে এবার—একটা নিজের পক্ষে, আরেকটা যারা তাকে বারম্বার ফেল করিয়েছিলো, অদূরদর্শী সেই অবিবেচকদের বিপক্ষে।

হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে যান, একটা কথাও বলেন না আর। নেহাৎ ছেলেধরাদের ভয়, নইলে এক্ষুনি তিনি এই অর্বাচীনের গাড়ি থেকে সুড়ুৎ করে নেমে পড়তেন! আগাম দেওয়া ভাড়ার টাকাও তাঁর মুখে

লাগাম দিয়ে রাখতে পারতো না! এমন নিরক্ষরের মোটরেও আবার মানুষ চাপে?

তাঁর আফশোষ হয়—ছ্যা! বলীরাজা একশো মুখ্যুকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গেও পা বাড়াতে সাহস করেন নি, বরঞ্চ জাহান্নমেই গেছলেন একলা—একটু টুঁ শব্দও না করে। আর তাঁকে কিনা, সেই জাতীয় একটা আকাটের সঙ্গে এক গাড়িতে চেপে কলকাতার বাইরে পাড়ি দিতে হচ্ছে! দুর্দৈব আর কাকে বলে?

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে নিঃশব্দে চলে মোটর—কারো মুখেই রা নেই। মৌলিক গবেষণার ধাক্কা খেয়ে ড্রাইভারও দমে গেছে বেজায়! অবশেষে বালি ব্রিজ এসে পড়ে। আপনা আপনিই আসে।

ড্রাইভারের আমতা আমতা আরম্ভ হয়—আপনারা তো তখন উড়িয়ে দিলেন আমায়! বললেন ওটা সেতুবন্ধ হতে পারে না কখ্খনো? তাহলে এটা কী? এটা বালি ব্রিজ হলো কেন তবে?

হর্ষবর্ধনের অটল গাম্ভীর্যকে নড়ানো যায় না, তবে তাঁর ভাইয়ের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় বটে—তুমিই বলো না বাপু!

ওইখেনে রামচন্দ্র সেতুবন্ধ করে এসে এইখানে বালিবধ করেছিলেন! তাছাড়া আর কি?

উত্তরটা হর্ষবর্ধনের সমীচীন বলেই মনে হয়, পৌরাণিক তথ্যের সঙ্গেও খাপ খায় যেন। এমন কি সেতুবন্ধের বিষয়টাও ড্রাইভারের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে, পুনর্বিবেচনার যোগ্য বলে তাঁর সন্দেহ হতে থাকে। হতে পারে, আগে ওটা আসলে রামের কীর্তিই ছিলো অবশেষে সুচতুর ইংরেজ পরে এসে সুযোগ বুঝে, কাউকে কিছু না বুঝতে দিয়ে চুপচাপ নিজের কৃতিত্ব বলে নিঃসন্দেহে চালিয়ে দিয়েছে! কিন্তু মনের সংশয় মনেই তিনি চেপে রাখেন, উচ্চবাচ্য করবার তাঁর উৎসাহ হয় না আর। বিশেষতঃ একটা অজ্ঞ—এমন কি বিশেষজ্ঞই বলা যেতে পারে অনায়াসে,—এহেন একটা লোকের সঙ্গে বাৎচিৎ করা কি তাঁর শোভা পায়?

বালিবধ না কচু। সব বাজে কথা। গোবরা মুখ বেঁকায়। আর বিরিজের ওপারে কী তোমার, শুনি? দণ্ডকারণ্য?

ও-পারে? আজ্ঞে দক্ষিণেশ্বর। তারপরে অর্ধ-স্বগতস্বরে নিজেকেই যেন সে জানায়। তোমাদের যমের বাড়ি আর কি!

অনুচ্চ অনুযোগটা কানে আসে গোবরার। য়্যাঁ, কি? যমের কথাটা কি বললে?

আজ্ঞে, যমলোক সটান দক্ষিণেই কিনা! শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে।

সে তো সবার জন্যেই দক্ষিণে—চিরকাল ধরেই ডানহাতি। তোমাদের

আমাদের কি আলাদা যমালয় নাকি? তোমার কি তাহলে উত্তর হবে, শুনি? গোবরা ভারি চটে যায়।

ড্রাইভার আর কথা বাড়ায় না, ভীম ততোক্ষণে হজম হয়ে, ভয়ানক রাগ জমেছে তার। বরাহনগর দিয়ে যাবার পথে, এটা যে দশ অবতারের অন্যতমের, অখাদ্যতমের পীঠস্থান সে সংবাদটাও জানাবার কোন প্রেরণা পায় না সে। টালা পেরিয়ে, খালকে ডান ধারে রেখে, বেলগেছের হাঁস-পাতালকে বাঁয়ে ফেলে, সেটা যে হংসলোক, হয়তো হংসবাহন স্বয়ং ব্রহ্মারই বাসস্থান সেকথা ঘুণাক্ষরেও না জানিয়েই মৌনব্রতী হয়ে সে এগিয়ে চলে। অবশেষে একটা বাগান বাড়ির কাছাকাছি এসে ভস্ করে থেমে যায় গাড়িটা।

পেট্রল ফুরিয়েছে মশাই। আর এক পাও চলবে না মোটর।

তা হলে নেমে পড়া যাক, কি আর করা যাবে? হর্ষবর্ধন বলেন—এটা কোন্ জায়গা? খান্ডববন নয় তো? সঠিক বলো বাপু! খান্ডব-দাহনে আবার মারা পড়তে পারবো না আমরা!

আজ্ঞে না বেলগেছে। বিনীত উত্তর আসে।

তাই ভালো! সামনে একটা বাড়িও আছে দেখছি! বেশ, এই বেল-গাছেই আমরা আশ্রয় নেবো। নিরাপদ স্থান--কি বলিস গোবরা?

সেই ভালো দাদা! ঐ গাছপালাওলা বাড়িটাই ভাড়া করে ফেলা যাক্। কলকাতা থেকে অনেক দূরেও আসা গেছে—নয় কি? তা কম্‌সেকম্ একশো মাইল হবে প্রায়! গোবরা আন্দাজ করে।

বাগানবাড়ির মধ্যে তাঁরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হন। জনমানবের চিহ্নও নেই কোথাও! পোড়ো-বাড়ি নাকি? হর্ষবর্ধনের হৃদয় কম্পিত হয়, গোবরারও গা ছমছম করে। কিন্তু নাঃ, একটা জানলার ফাঁকে জনৈক বালকের মাথাই দেখা যায় যেন। যথেষ্টই ভরসা মেলে তারপর।

আরেকটু এগোতে, সেই ছেলেটি বেরিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নেয়—এই যে, এসে পড়েছেন দেখছি! অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্যে! এত দেরি হলো কেন?

দেখেই দুভায়ের একেবারে চক্ষুস্থির—আর কেউ না, তাঁদেরই সদ্য-পরিচিত অদ্যকার-আলাপী শ্রীমান বাঁটুকুল।

আকাশকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করে? হর্ষবর্ধন তাই করে বসলেন। বসলেন বললে ঠিক বলা হয় না, বরং সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে একেবারে তিনি ধরাশায়ী হলেন।

বাঁটুকুলকে অকস্মাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠতে দেখে তার মাথা ঘুরে গেলো। পড়ে যাবার মুখে তিনি আকাশকে ধরতে গেলেন, ধরে আত্মসম্বরণ করতে

গেলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না, গোবর্ধনের ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন।

দাদার এই কাণ্ডে গোবরাও বাত্যাতাড়িত কদলীকাণ্ডের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ধুলিসাৎ হয়ে গেলো। বাঁটকুল এগিয়ে এসে সান্ত্বনা জানালো—আহা-হা! বড্ড লাগলো নাকি?

হর্ষবর্ধন উঠে বসেছেন ততোক্ষণে, বাঁটকুলের অনুসন্ধিৎসার জবাবে তাঁর মুখ থেকে একমাত্র এবং একমাত্রা যে ধ্বনি বেরিয়েছে, তাকে ঠিক হর্ষধ্বনি বলা যায় না। তিনি শুধু বলেছেন—নাঃ!

গোবরাও উঠেছে, গায়ের ধুলো ঝেড়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে এ বৃথা আড়ম্বর কেন? মৃত্যুর মুখে পা বাড়িয়ে কি কেউ জুতো বুরুশ করে? এই বিটকেলরা যেরকম ভয়ংকর লোক, তাতে এক্ষুনি হয়তো আস্ত গায়ের চামড়াই খুলে নেবে, আর চামড়াই যদি গা থেকে ছেড়ে গেলো, তখন চামড়ার ধুলো ঝেড়ে লাভ?

বাঁটকুল বলে, কি মশাই, পৃথিবীটা গোলাকার, কি বলেন?

ভূগোলবিদ্যায় গোবরার বুৎপত্তিই বেশি, সেই উত্তর যোগায়—হ্যাঁ, বেজায় গোল এই পৃথিবীতে!

ভেবেছিলেন পালিয়ে আমাদের হাত এড়াতে পারবেন, কিন্তু দেখলেন তো! বাঁটকুলের শব্দভেদী বাণ-প্রয়োগ।

এ পর্যন্ত যা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাতেই রক্ষে নেই, তার ফলেই মাথা গুলিয়ে যাবার যোগাড়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাকে বিচলিত করছে, এর পরেও আরো না জানি কী দেখতে হয়। এতাবৎ যা দেখছেন তাতেই তাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে, কলকাতায় তাদের বাসায় একটু আগে যে বাঁটকুল, কলকাতা ছাড়িয়ে একশো মাইল দূরে এসেও সেই বাঁটকুল! এই একটিমাত্র দৃশ্যেই তো তারা 'থ' হয়ে গেছেন—কিন্তু এর পরে বাঁটকুলেশ্বর বিটকেল-সম্রাট এসে তাদের আবার হাড়গোড় ভাঙা 'দ' না করে দেয়! সেই অ-দৃষ্টের, অ-দেখা অদৃষ্টের কিম্বা আগামী দ্রষ্টব্যের ভাবনা ভেবেই হর্ষবর্ধন বেশি কাতর হন।

গোবরার দূরদৃষ্টি স্বভাবতই একটু কম, কাজের আসন্ন দূরদৃষ্টি তাকে ততো ভাবিত করেনি, তখন পর্যন্ত কৌতূহলের ভারেই সে মুহ্যমান হয়েছিলো। তাছাড়া দাদা থাকতে তার ভাবনা কী? বড়ো বড়ো যা কিছু চোট দাদার উপর দিয়েই যাবে, তার যা কিছু ভাবনা কেবল দাদাকে নিয়ে।

তুমি ভেলকি জানো না কি হে ছোকরা? গোবরা আর জিগ্যেস না করে পারে না শেষ পর্যন্ত।

জানি বইকি। জানতে হয় বইকি। বাঁটকুল চোখ মটকে বলে—সব কিছুই জানতে হয় আমাদের।

তুমি নিশ্চয় অন্তর্যামী। নইলে আমরা এখানে আসবো, তুমি জানলে কি করে? তাছাড়া এতো দূর এসে আমার মোটরের কল বিগড়োবে তাই বা টের পেলে কি করে? তুমি সহজ পাত্র নও। বারম্বার ঘাড় নাড়ে গোবরা।

নই-ই তো! বাঁটকুলও নিজের সম্বন্ধে সায় দেয়।

তুমি নিশ্চয় ডাইনী-বিদ্যে জানো? হর্ষবর্ধন কথা বলেন এতোক্ষণে—তা নইলে আমাদের আগে এখানে এসে পোঁছলে কি করে? মোটরে চেপে আসোনি তো! নিশ্চয় তুমি উড়ে এসেছো! নিশ্চয়, আমি বলতে পারি হলপ করে।

আকাশে ওড়ার কায়দাটা শিখিয়ে দেবে আমায়? গোবরা বায়না ধরে বসে।

সে আর এমন শক্ত কি! বাঁট্‌কুল হাত পা নেড়ে গুপ্ত বিদ্যাটা ব্যক্ত করে—তেতলা বাড়ির ছাদে উঠতে হয়। আরো উঁচু হলে আরো ভালো। তারপর কার্ণিশ থেকে মারো লাফ!

হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে আর কি! গোবরার একদম বিশ্বাস হয় না। তাহলে আর দেখতে শুনতে হবে না!

আমি মাটিতে লাফ মারতে বলছি কি? আকাশে লাফ মারুন। তারপর যেমন করে লোকে জলে সাঁতার কাটে তেমনি করে বাতাসের মধ্যে সাঁতার কেটে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যান।

সাঁতার কাটতে কাটতে? তবু যেন সন্দেহ থাকে গোবরার।

পাখিদের মতোই—হুবহু। তবে আর বলছি কি!

আর মন্তর? মন্তর টন্তর কিচ্ছু নেই?

মন্তর একটা আছে বই কি! এক সময়ে বলে দেবো'খন।

গোবরা উল্লসিত হয়ে ওঠে—চলো চলো তবে, ছাদে যাওয়া যাক, এক্ষুনি চলো।

সবুর করতে রাজি নয় গোবরা।

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ চক্ষে তাকান—পারবি কি উড়তে? তা তুই হাল্‌কা পল্‌কা আছিস, পারতেও পারিস। আমার দ্বারা কিন্তু পোষাবে না! বলে, জলেই সাঁতার কাটতে পারি না আমি!

চলো না দাদা, পরীক্ষা করেই দেখা যাক। তর সয়না তার—এমন আর শক্তটা কি! আকাশে ওড়া বইতো নয়!

উঁহু। আমি পারবো না বাপু। হর্ষবর্ধন ততো উদ্‌ব্যস্ত নন!

ছিঃ! পারবো না বলতে আছে কি! নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস না থাকলে জীবনে বড়ো হবে কি করে, বলো দেখি? গোবরা উপদেশ দেয় দাদাকে।

খুব পারবেন! চেষ্টা করে দেখুন না। বাঁটুকুলও উৎসাহ দেয়।

পড়োনি পদ্যপাঠে? মনে নেই তোমার? সনাতন পদ্যপাঠ থেকে গোবরা সদ্য সদ্য পঙ্কোদ্ধার করে!

পারিবো না এ কথাটি বলিয়ো না আর।
কেন পারিবেনা তাহা ভাবো একবার॥
সকলে পেরেছে যাহা তুমিও পারিবে তাহা—

তাহাতে গিয়ে গোবরার একদম আটকে যায়, তারপর?

তারপর কী?

হর্ষবর্ধন মাথা চুলকান—লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি চাপা পড়ে সেই—? তাঁরও দম আটকায়।

উঁহু, উঁহু। ওতো কথামালা, ওকি তোমার পদ্যপাঠ?

পিতা-মাতা গুরুজনে ভালোবাসো প্রাণপণে? এবার, ধারাপাত কি ব্যাকরণ কোত্থেকে বলা যায় না, হর্ষবর্ধন আরেক দফা বহুৎ টানাটানি করে বার করে আনেন।

নাঃ, তোমাকে স্মৃতিরত্ন উপাধি কিছুতেই দেওয়া যায় না দাদা! তুমি আবার বলো যে আমার মেমারি নেই! তোমার মনে আছে বাঁটকুল?

মনে নেই, তবে মিলিয়ে দিতে পারি—সকলে পেরেছে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা, না করিয়া উহু আহা এধার ওধার!

তোমার মাথা। তুমি তো পদ্যপাঠ আনতে গিয়ে ঠাকুরমার ঝুলি এনে ফেললে একেবারে! তোমাদের কর্ম নয় হে বাপু। বলে আমারই গিয়ে মনে নেই, তো তোমরা! যাকগে অতো মনে করে আর কি হবে? উড়ে দেখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ওড়া নিয়ে কথা।

আমার দ্বারা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এ দেহে অসম্ভব।

তোমার সেই এক গোঁ। কেবল পারবোনা আর পারবোনা! কেন পারবেনা শুনি? রাগ হবার কথাই, গোবর্ধনের রাগ হয়।

হাতীকে কখনো উড়তে দেখেছিস? হর্ষবর্ধন সলজ্জভাবে বলেন। কিন্তু বলে ফেলেই, তাঁর লজ্জা হয়—নিজের সম্বন্ধে নিজের উক্ত সমালোচনা তাঁর ঠিক সমীচীন বোধ হয় না, তিনি কথাটা ঘুরিয়ে নেন! আরশোলারাই ওড়ে! ফড়িংদেরও উড়তে দেখেছি! তারাই পারে, তাদের পক্ষেই সম্ভব।

বেশ, তাতে আর কী হয়েছে। আমি একাই উড়বো। আরশোলাই হই, আর তেলোপোকাই হই, আমার কিছু যায় আসে না। চলো তো হে বাঁটকুল মন্তরটা বলবে আমায়।

গোবরা বাড়ির ছাদে রওনা হবার জন্য পা বাড়ায়, অনন্তআকাশে উধাও হবার তার অদম্য সংকল্প।

আগে চলে বাঁটুকুল, তারপরে গোবরা, পরিশেষে হর্ষবর্ধন।

যেতে যেতে দাদা বলেন—যাচ্ছিস যখন, তখন আসামের দিকেই যাস। বিটকেলদের বেহাতে পড়েছি, তোর বৌদিকে খবরটা দিস গিয়ে! আমি এখানেই থাকলাম, আমার দ্বারা আর উদ্ধার হওয়া হলো না। কি করবো? উড়তেই পারবোনা যে, যা মোটা হয়ে জন্মেছি। দুকানে ডবল মন্তর নিলেও না!

হর্ষবর্ধনের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়তে থাকে।

কি বলবো বৌদিকে?

বৌদিকে? কি বলবি? কী আর বলবি! বলবার কিই বা আছে! তুই কি আর সে কথা বলতে পারবি? একটা চক পেলে লিখে দিতুম তোর পিঠে।

কি কথাটা বলোই না, পারবো আমি।

উঁহু। তুই উচ্চারণ করতেই পারবি না, সে কথা তোর মুখেই আনতে নেই।

বাঁটুকুল পকেট থেকে এক টুকরো কপিং পেনসিল বার করে দেয়। এইটা দিয়ে ওঁর কামিজের পেছনে লিখে দিন! তারপরে জলের ঝাপটা মারলেই লেখার রং খুলে যাবে। একেবারে রাঙন কালির মত দেখাবে।

সেই ভালো। তোর পিঠের দিকে লিখি। তাহলে তুই দেখতেও পাবিনে! তুই যে এখনও ছেলেমানুষ! নিতান্ত নাবালক কিনা! কতো সামলে রাখতে হয় তোকে আমার। নইলে তোর বখে যেতে কতোক্ষণ?

হর্ষবর্ধন বোম্বাই ছাঁদে গোবরার পিঠে 'যাও পাখি বলো তারে'—এই পর্যন্ত লিখেছেন, এমন সময় হর্ণ বাজিয়ে একটা মোটর ঢোকে বাগানের গেট দিয়ে। হর্ষবর্ধন সাহিত্যচর্চা স্থগিত রেখে দেখেন, সেই ধূসর রংয়ের ভাড়াটে মোটরটা। ইতিপূর্বে যা তাঁদের বাহনের স্থান অধিকার করেছিলো, সেই গাড়িটাই!

বাঁটুকুল বলে, আপনারা এই ঘরের মধ্যে বসুন। আমাদের বিটকেল সম্রাট এসে পড়লেন।

শোনবামাত্রই হর্ষবর্ধনের হাত থেকে পেন্সিল খসে পড়লো। সেইখানেই তিনি উপবিষ্ট হলেন, ধূলিমলিন মেঝের উপরেই। এবং গোবরা এসে পড়লো তাঁর কোলে—নিজের (এবং দাদার) অনিচ্ছাসত্বেই। হর্ষবর্ধনের সমস্ত শক্তি যেন মুহূর্তে মধ্যে লোপ পায়, এটুকু ক্ষমতা থাকে না যে গোবরাকে নামিয়ে রাখেন এবং গোবরারও এমন শক্তি নেই যে নড়ে বসে।

বিটকেল-সম্রাট যখন ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলেন, তখন হর্ষবর্ধন—যে-তিনি একটু আগে শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীলা দেখাতে অপারগ হয়ে-

ছিলেন সেই-তিনিই—শ্রীকৃষ্ণের আরেক লীলা প্রকট করেছেন। গোবর্ধন-ধারণ করে বসে আছেন—মহাসমারোহে।

সম্রাট ঢুকেই বাঁটকুলকে প্রশ্ন করলেন, এ কি? এঁদের এরকম করে বসিয়ে রেখেছো কেন? ঘরে কি টেবিল চেয়ার নেই?

আমি কি রেখেছি? ওঁরা নিজেরাই বসে আছেন অমনি হয়ে। বাঁটকুল জবাব দেয়। ভায়ে-ভায়ে কোলাকুলি করছেন বোধহয়!

উঁহ। এটা ঠিক ভদ্রতা হচ্ছে না। অতিথি মানুষকে মাটিতে বসিয়ে রাখা কি ভালো? ওঁদের চেয়ারে বসিয়ে দাও।

বিটকেল-দলপতি নিতান্তই ভদ্রলোক, ভয়াবহ কিছু নন, দেখে হর্ষবর্ধনের সংজ্ঞা ফিরে আসে। বাঁটকুলের বিনা সাহায্যেই ওরা চেয়ারে বসতে পারেন।

সম্রাটও একটা চেয়ার টেনে নেন। বেশ। এইবার একেবারেই কাজের কথা হোক। কেমন কিনা? টাকাটার ব্যবস্থা করেছেন? এনেছেন?

আজ্ঞে না। সবিনয়ে বলেন হর্ষবর্ধন। সঙ্গে আনতে পারিনি।

আনবো কি করে? এখানে আসতে হবে জানি না তো আমরা—গোবর্ধন জবাব দেয়! আন্দাজ করতেই পারিনি, বলতে কি।

টাকাটা আনাবার ব্যবস্থা করুন তাহলে। নাহলে তো ছাড়া পাবেন না সহজে। সম্রাটের বিটকেলত্ব ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে।

আনাবো কাকে দিয়ে? ছাড়া না পেলে আনবোই কি করে? আমাদের তো আর কেউ এখানে নেই। হর্ষবর্ধন অনুযোগ করেন—এক আমরা নিজেরা ছাড়া।

তাহলে দেশেই খবর দিতে হয়। বেশ, ঠিকানা দিন দেশের, আমরাই খবর দেবো। বিটকেল-সম্রাটের অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু মশাই, একটা কথা বলি, আপনাদের টাকা অঢেল, খবর পেয়েছি আমরা। দশ হাজারের কথাই আর নয়, গোড়াতেই বলে রাখা ভালো! পঞ্চাশ হাজারের এক পাই কমে ছাড়ছিনে আপনাদের, এ হেন দামী মাল তো সস্তায় ছাড়া যায় না? হুঁ।

তাতো ঠিক। গোবরা ঘাড় নাড়ে। পরে পস্তাবে কে?

হর্ষবর্ধন বলেন—টাকার জন্যে আমরা ভাবছি কি—

তাহলে ঠিকানাটা দিয়ে ফেলুন 'চট্' করে। আমরা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

আমাদের দেশ হলো গে আসামে। ঠিকানা হচ্ছে—হর্ষবর্ধন বলতে উদ্যত হন।

উঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—গোবর্ধন বাধা দেয়, মুখ বুজেই সে আপত্তি জানায়—বিনাবাক্যব্যয়ে। হুঁ—উঁ—উঁ—উঁ।

উ'হ্—কু'হ্ করছিস কেন? বাধা পেলেই বিরক্তি জাগে দাদার।

তুমি করছো কি বলো তো? দেশের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছো ওদের? বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হয় গোবরাকে। আমরা তো খোয়া গেছিই, শেষটায় বৌদিও খোয়া যাবে নাকি? ভয়ের কাথাটা প্রকাশ করেই বলতে হয়।

হর্ষবর্ধন একটু ঘাবড়েই যান। তাইতো! কথাটা বেফাঁস বলেনি গোবরা, মাথা ঘামাতে হয় তাঁকে। সম্ভাবনাটার ভালো মন্দ সব দিক সুচারুরূপে বিবেচনা করতে হয়।

অনেক ভেবে চিন্তে ক্ষতির দিকটা নিখুঁৎ করে খতিয়ে, অবশেষে তিনি মাথা চালেন—তা খোয়া গেলেই বা। নিজেদের তো বাঁচতে হবে আগে। আর স্বয়ং আমিই যদি খোয়া যেতে পেরে থাকি, তাহলে তোর বৌদিই বা কি এমন লাট যে—? আমার চেয়ে বৌদিই তোর বড়ো আপনার হলো না কি?

তুমি বলছো কি দাদা? গোবরা ফোঁস করে ওঠে, অমন কথা মুখে আনাও পাপ। বৌদি হারালে কি পাওয়া যাবে আর।

ব্যস, তুই অবাক করলি গোবরা? বৌদির ভাবনা কি তোর? কতো চাই? আমি বিয়ে করলেই তো বৌদি। পথে ঘাটেই পড়ে আছে, দেশে বিদেশেই ছড়ানো—বৌদি কতো চাস?

অসংখ্য বৌদির প্রলোভনে গোবরার মন টলে না—একটি মাত্রের ওপরই ওর টান—কিন্তু ওই রকমটি কি হবে দাদা?

হর্ষবর্ধন আবার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হন। অনেকক্ষণ ধরে বহুৎ সাঁতার কেটে, বিস্তর নাকানি চুবানি খেয়ে, তাঁর গবেষণালব্ধ সার সত্যটি উদ্ধার করেন—আমি ভেবে দেখলাম, গোবরা, সব বৌদিই এক। ঠিক চীনাম্যানদের মতোই। চীনাম্যানে চীনাম্যানে কি পার্থক্য আছে কিছু?—থাকলেও টের পাওয়া যায় না, চোখেও ধরা পড়ে না। দেখতেও সব হুবহু এক রকম, চাল চলনেও তাই—তেমনিই সব বৌদিই সমান।

হর্ষবর্ধন ঠিকানা বলতে প্রস্তুত হন।

গোবর্ধন বলে—কিন্তু আমাদের বৌদি কি রকম পাঁপর ভাজে? দাদাকে স্বপক্ষে আনতে চেষ্টা করে সে, সহজে হাল ছাড়ে না। উদরের ভেতর দিয়ে আবেদন চালিয়ে দাদার হৃদয়কে বিগলিত করবার তার প্রয়াস, এ রকম বৌদিকে তুমি পর ভাবতে পারো?

হর্ষবর্ধন একটু হেলেন।

আর কিরকম বেগুনি বানায়? গোবরার দ্বিতীয় দফা ওকালতি—বিলিয়ে দেবে এমন বৌদি?

হর্ষবর্ধন টলায়মান! বেগুনির গুণ বৌদিকে সংক্রামিত হয়ে তাঁর মনকে গলিয়ে দেয়।

আর কী চমৎকার কুলের আচার তৈরি করে, বলো দেখি? গোবরার এবার ব্রাহ্মাস্ত্র-নিক্ষেপ!

অবিলম্বে হর্ষবর্ধনের জিভে জল এসে পড়ে।

বিটকেল সম্রাট তাড়া দেন—কই মশাই, কী হলো?

হর্ষবর্ধনের ভোট গোবরার বৌদির তরফে চলে গেছে ততোক্ষণে, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, যাই হোক, যতো বাড়াবাড়িই হোক, বাড়ির ঠিকানা তিনি দেবেন না কিছুতেই। প্রাণ গেলেও না। বেগুনিশীল বৌদি—থুড়ি—বৌকে, দাতব্য জিনিসের ভেতরে ভাবতেই পারা যায় না।

দেরি হচ্ছে কেন? সম্রাট তাড়া দেন, মনে পড়ছে না ঠিকানাটা?

হর্ষবর্ধন বললেন—না মশাই, না সম্রাট-মশাই, না। অমন কুলাচার-বিগর্হিত কাজ আমি করতে পারবো না, মাপ করবেন। বলেই মুখের ঝোলটা টেনে নেন!

তবে মরে পচুন ঘরে—মরে ভূত হয়ে যান। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে এই কথা বলে বেরিয়ে যান বিটকেল-সম্রাট, বাঁটকুলকে নিয়ে।

বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে কী একটা সুইচ টিপে দেন। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে কেমন করে সেই ঘরের দরজা জানলা সব আপনা হতেই ঝপা-ঝপ বন্ধ হয়ে যায়।

মুহূর্তের মধ্যেই সূচীভেদ্য অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে কেবল হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন। পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে—এবং তাঁরা তর্‌তর্‌ বেগে নেমে যাচ্ছেন অন্ধকার-গর্ভে!

হর্ষবর্ধন এবং তস্য ভ্রাতা, যখন সোজা রসাতলের যাত্রী, অন্ধকারের অতল গর্ভেই নিঃশব্দে পা বাড়িয়েছেন, কিম্বা পা বাড়িয়ে বসে আছেন,—বসে আছেন? বসে আছেন, ঠিক বলা চলে কি? অতল গর্ভে পা বাড়িয়ে বসে থাকাটা একটু অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয় যেন! কিন্তু সে যাই হোক, সেই মারাত্মক মুহূর্তে, পাশের ঘরে সম্রাট এবং তাঁর সদস্যের মধ্যে ঘোর গুরুতর পরামর্শ ঘনীভূত—

কি রকম বুঝছিস বাঁট্‌কুল?

সম্রাটের এই প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী মুখখানাকে খুব গম্ভীর করে এনেছেন—পদোচিত মর্যাদা বজায় না রাখলে মুরুব্বিদের চলে কি?—তারপর ঘাড় নেড়ে বলেছেন—গতিক বড়ো সুবিধের না, মশাই!

তাই মনে হচ্ছে। বড়ো ভাইটা তো আস্ত একটা আকাট—

আর ছোটোটা হচ্ছে কাঠ-গোঁয়ার!

যখন একবার না বলেছে তখন ওদের কাছ থেকে দেশের ঠিকানা বের করা যাবে কিনা কে জানে!—সম্রাট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছেন—আর বাড়ির লোকরা খবর না পেলে একগাদা টাকা নিয়ে হাঁদাদের কে উদ্ধার করতে

আসবে?

তাইতো! তা ছাড়া—বাঁটকুল মুখখানাকে বিরাট একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে আনে—তা ছাড়া আরো ভাবনার কথা!

কি, কি? সম্রাট উৎকণ্ঠিত হন—আবার ভাবনার কথা কিহে? গোদের ওপর বিষফোঁড়া নাকি?

অনেকদিন ধরে না বলে বলে শেষে হয়তো নিজেরাই ভুলে যাবে বাড়ির ঠিকানা! ওরা যেরকম এক নম্বরের বোকা তাতে আশ্চর্য নয়।

কিছু আশ্চর্য না! বিটকেল সম্রাটের দ্বিতীয় দফা কাতরোক্তি।

তাইতো, কি করা যায়! সম্রাট অবশেষে একটা সমাধানে এসে পৌঁছোন—পুলিসেই যাবো নাকি?

পুলিসে! পথ-চলতি লাফাতে লাফাতে বাঁটকুল যেন কলার খোসায় আছড়ে পড়ে হঠাৎ। পু—লি—স্! পুলিস কেন?

একটা লোক জলজ্যান্ত পাড়া থেকে খোয়া গেলো, পুলিসে গিয়ে খবর দেওয়া দরকার নয় কি? পাড়ার লোক হিসেবেই তো আমার যাওয়া উচিত! পাড়ার লোকের প্রতি একটা কর্তব্য নেই?

বাসরে! রসা রোড কি আমাদের পাড়া নাকি? আমরা তো বেলগেছের।

হলোই বা বেলেগেছে, সমস্ত পৃথিবীটাই আমাদের পাড়া। যার টাকা আছে এবং টাকাটা মারবার সুযোগ আছে, সেই আমাদের আপনার লোক! আমরা দেশভক্তদেরও এক কাঠি ওপরে। বিশ্বপ্রেমিক আমরা—আমাদের বসুধৈব কুটুম্বকম্।

তা বলে পুলিস কিছু আমাদের আত্মীয় নয়। বাঁটকুল বলে।

নয় কি রকম? মাসতুতো ভাই না হোক, পিসতুতো ভাই তো বটে। ও একই কথা। ওদের না হলে হয়তো আমাদের চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে ওদের চলে কখনো? আজই যদি আমরা ধর্মঘট করি, কালই ওদের চাকরি খতম। পুলিসের আর দরকারই থাকবে না বলতে গেলে।

কিন্তু—কিন্তু—আমরাই গিয়ে—আমাদের বিরুদ্ধে খবর দেবো তো? সেটা কি ঠিক হবে? বাঁটকুল ভয়ানকভাবে বিবেচনা করে—তাহলে আমরা তো আমাদের ধরিয়েও দিতে পারি। তফাৎ আর কতোদূর?

হ্যাঁ, অতোখানি স্বার্থত্যাগ করতেই যাচ্ছি কিনা আমি। ধরিয়ে দিতেই যাচ্ছি আর কি? ধরা পড়বার জন্যে ভারি মাথাব্যথা পড়েছে আমার? হর্ষবর্ধনদের বিটকেলরা ধরে নিয়ে গেছে, আমি শুধু এই খবরটা গিয়ে দেবো কেবল? পুলিস থেকে যখন খবর-কাগজওলারা পাবে, তখন দেশ-সুদ্ধু জানাজানি হয়ে যাবে। খবরের কাগজে বেরিয়ে গেলেই তো ঢি ঢি? আর—

আর—?

বাঁট্‌কুল বিস্ময়ে হাঁ করে বিটকেল সম্রাটের বুদ্ধিবৃত্তির বহর দেখে।

আর—আসামে ওদের বাড়িতে কি আর খবরের কাগজ যায় না? নিশ্চয় যায়, ওরা বড়লোক যখন। তাহলে ওদের দেশের লোক, বাড়ির লোক, সবাই কর্তা-চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা টের পাবে। এবং ওরা কি আর হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে না? অমন মূল্যবান জিনিস ছেড়ে দেবে, অমনি? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের ঠিকানা জানিয়ে বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করবে ওদের উদ্ধারের জন্য। বুঝেছিস? আমি সোজা থানাতেই চললাম—

তা বটে! কিন্তু—যদি উল্টো রকম ঘটে যায়। পুলিস উল্টো বুঝে তোমাকেই সন্দেহ করে পাকড়ে রাখে? তবে?

তাহলে—তাহলে একটা ভাবনার কথা বটে! কিন্তু পুলিস কি অতো-খানি ভুল করবে? সম্রাট ভারি সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়েন।

তার চেয়ে আমি বলি কি, কাজ নেই পুলিসে গিয়ে। টাকা আদায় না হলো, নাই হলো, ওদের দলভুক্ত করে নেওয়া যাক বরং,, কি বলো তুমি? টাকার বদলে ওদের আমাদের দলে টেনে নিলেই তো হয়? রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন ছিলো, তোমার সাকরেদ মোটে সাতজন আছি আমরা, ওরা হলে এখন নবরত্ন হয়ে যায়!

নবরত্ন না কচু! বিটকেল সম্রাট মুখ বেঁকায়, ওই পুরোনো বস্তাপচা রত্নদের আর নব[illegible]! বলে চালাসনে বাঁটকুল!

আহা, সে নব [illegible]ন? ন-জনে যে নব হয়, সেই নব! বাঁট্‌কুল বিটকেল সম্রাটকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

নবরত্ন না ছাই! বিটকেল সম্রাটের বদন এবার অষ্টাবক্র হয়ে ওঠে, এইসব গবরত্নদের দিয়ে দল গড়লেই আমার হয়েছে! তাহলে আর দেখতে হবে না!

অমন একটা সমীচীন প্রস্তাব এভাবে মাঠে মারা যাওয়ায় বাঁট্‌কুলেরও রাগ হয়ে যায়—তাহলে ঐ বিটকেলাদিত্য হয়েই থাকলে, বিক্রমাদিত্য হওয়া হলোনা তোমার, আর তেমন নামজাদাও হতে পারলে না তো!

আসল রত্ন আনতে পারিস, নিয়ে আয়! আদর করে বেছে নেবো। গলায় ঝুলিয়ে রাখবো—হ্যাঁ। কিন্তু ওসব ভেজালে আমি নেই বাপু! বলতে বলতে বিটকেল-সম্রাট বীরপদক্ষেপে বেরিয়ে যান—আমি সোজা থানাতেই চললাম। হ্যাঁ—

এবং বাঁট্‌কুলের—হাঁচি পড়ে যায়—বিটকেল সম্রাটের বেরোবার মুখেই, সেই মুহূর্তেই। কিছুতেই চেপে রাখা যায় না।

হর্ষবর্ধনরা যখন তরতর বেগে নেমে চলেছেন অন্ধকার-গর্ভে, দাঁড়াবার

তর সইছে না, সেই সময়ে কোত্থেকে যেন খিল খিল হাসি ভেসে এলো!

চমক লাগে হর্ষবর্ধনের। নাঃ তিনি হাসেননি, হাসবার মতো তাঁর মনের অবস্থা নয়। এবং মুখের অবস্থা? যদিও এখন আয়নার দিকে তাকাবার অবকাশ নেই এবং সুযোগই বা কই, তবু তিনি অনায়াসেই, নিজের মুখের দিকে না তাকিয়েই, বলে দিতে পারেন যে, সেখানেও প্রায় তথৈবচ। কষ্টে-সৃষ্টে কাষ্ঠ-হাসি হাসতে পারাও তাঁর পক্ষে কঠিন।

ভূত নয় তো?

হর্ষবর্ধনের বুক কাঁপতে থাকে। হাত বাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেই জাপটে ধরেন গোবরাকে।

খিল-খিল-ধ্বনির পরেই, খিল খোলার ধ্বনি। দরজা খুলে, অগুন্তি আলোর সঙ্গে, বাঁটকুল ঘরে ঢোকে।

বাঃ! এই যে, ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি হচ্ছে আবার! বেশ বেশ!

গোবর্ধন লজ্জিত হয়ে নিজেকে দাদার বাহুপাশ থেকে বিমুক্ত করে। কেন কি হয়েছে?—তপ্তকণ্ঠেই সে বলে, নিজের ভাই থাকতে, কোলাকুলি করবার জন্যে পরের ভাইকে ডাকতে হবে নাকি?

হর্ষবর্ধন চারিধারে তাকিয়ে দেখেন। তাইতো! তাঁর কণ্ঠ থেকে বিস্ময়ধ্বনি বেরোয়।

সেইখানেই আছি তো! সেই ঘরেই—দূর দূর!

আফশোষ হতে থাকে তাঁর—ভাবলাম নাকি পাতালেই যাচ্ছি! বলিরাজার মুল্লুকে! দূর দূর! সব ভূয়ো! অন্ধকারে মাথাটা ঘুরে গেছলো কেবল।

বাঁটকুল তার দার্শনিক চিন্তাধারায় বাধা দেয়--কি মশাই? কি ঠিক করলেন? ঠিকানাটা মনে পড়লো? না কি?

য়্যাঁ? ঠিকানা? কিসের ঠিকানা? কার ঠিকানা?—হর্ষবর্ধন তখন পর্যন্ত ঠিক পৃথিবীতে এসে পেঁছোতে পারেননি। কোথাকার ঠিকানা? পাতালের? বলিরাজার ঠিকানা চাইছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দিয়েই ফেলুন না দয়া করে। একবার দিয়ে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ভুলে বলে ফেলতেও তো পারেন। ভুলে বললে দোষ কি আর?

বলিরাজার ঠিকানা? বটে? হর্ষবর্ধন দাড়িতে হাত দেন, ভাবিত হয়ে পড়েন ভারি, চোখ মুখ কপাল সব কিছু সিঁটকে ওঠে ওঁর। অবশেষে গোবরার দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন—জানা আছে নাকি তোর? বলির ঠিকানাটা—?

বলাবলি আর কি? গোবরা বলে বাঁটকুলকে—তুমি যদি আমাকে ওড়বার

মন্ত্রটা শিখিয়ে দাও, এক্ষুণি তাহলে আমি তোমাকে বৌদির ঠিকানাটা বলে দেবো।

সে আর বেশি কথা কি? বাঁট্‌কুলের উৎসাহ উছলে ওঠে, এই কথা? এ আর ক'টা কথা? এই তো মন্ত্র।—টা টি টুকুমুক টেন অ বাটায়? শিখে নিন। মুখস্থ করে ফেলুন চটপট।

টা টি টুকমুক টেন অ বাটায়? কেবল এই? আর কিছু না?

গোবর্ধনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় সন্দেহবাদ! মন্ত্রে তো অনুস্বর বিসর্গ থাকে। কই? অং বং কোথায়? নিশ্চয় আছে আরো।

এইটুকুই তো জানি, আর তো জানিনে। বাঁট্‌কুল নিজের নিঃস্বতা জানায়।

আবার কি? মন্ত্র আমার কত বড় হবে? বাঁটকুলের হয়ে হর্ষবর্ধনই ওকালতি করেন—দেড় গজ হবে নাকি? মন্ত্র তো ফলার করার জিনিস নয়! ফলা নিয়ে কথা! ফলাও করার কথা।

হ্যাঁ কথায় বলে—ফলেন পরিচীয়তে! ফলিয়ে দেখুন না তাহলেই টের পাবেন তখন। বাঁট্‌কুলও সায় দেয় সেই সঙ্গে, টা টি টুকমুক টেন অ বাটায়! আওড়ান আর উড়ুন! ব্যস!

উড়বো বইকি! উড়বো না তো কি ছাড়বো! পড়ে থাকতে যাবো না কি তোমাদের এই মগের মুল্লুকে? তবে কিনা পাখা গজালেই হলো। আর কিচ্ছু চাই না।

বেশ, এইবার তবে বৌদির ঠিকানাটা দিয়ে ফেলুন দিকি।

তোমার বৌদি নয়, বৌদি আমার। গোবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলে—তোমারও বৌদি না এবং এই ভদ্রলোকেরও না। বৌদি হচ্ছে আমার কেবল একা আমার। মুখ সামলে কথা বলো, বুঝলে হে ছোক্‌রা? বৌদির গর্বে গোবরার বুক আরো ফুলে ওঠে—দাদার বিয়ে দিয়ে তবে বৌদি পেতে হয়। বাবার বিয়ে দিয়ে দাদা, আর দাদার বিয়ে দিয়ে তবে বৌদি! অতো সস্তা নয়। দাদা আছে তোমার, যে, বৌদি পাবে? অতো সহজ নয় বৌদি পাওয়া। একটা বৌ কিম্বা দিদি পাওয়ার চেয়ে শক্ত। তারপর বলে —হ্যাঁ, ঠিকানা চাচ্ছিলে তুমি! বৌদির ঠিকানা হচ্ছে আসাম।

আসাম তা তো জানি, কিন্তু আসাম কোথায়? বাঁট্‌কুলের ব্যাকুল প্রশ্ন।

আসাম! কোথায়! দাঁড়াও বলছি—গোবর্ধন অগত্যা বাধ্য হয়ে ভূগোল সন্তরণ করে—আসাম হচ্ছে বাংলাদেশের মাথায়। একেবারে মাথার চূড়ামণি আর কি। এককথায় শিরোমণি। আর—আর সেই হিমালয়ের পাদদেশে। প্রায় পাদদেশেই, বলতে গেলে।

এমন লম্বা ঠিকানায় কি বুঝবো। খোলসা করে বলুন না।

আরো খোলসা করে? হিমালয় কোথায় জানতে চাও নাকি। হিমালয়

খুঁজে পেলে আসামও খুঁজে পাবে। খুব সহজেই পাবে। নেপাল ভুটান আসাম প্রভৃতি সব কাছাকাছি। আর হিমালয়, হিমালয় হচ্ছে ভারতবর্ষের উত্তরে—বিলকুল উত্তরে—

সারা উত্তর জুড়ে হিমালয়—গোবরার সদুত্তর।

সবাই জানে। তা কে জানতে চেয়েছে? বাঁটকুল ঠোঁট উল্টোয়।

তবে কি ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষ কোথায় জানতে চাও নাকি? ভারতবর্ষ হচ্ছে হিমালয়ের দক্ষিণে, আমরা যার ওপর দাঁড়িয়ে আছি। গোবর্ধন ব্যক্ত করে। সহজেই করে দেয়।

দেখুন দিকি মশাই! বাঁটকুল এবার হর্ষবর্ধনকে মধ্যস্থ মানে, আমার কাছে মন্ত্রটা জেনে নিয়ে ঠিকানাটা দিচ্ছেন না এখন। এটা কি ওঁর ভালো হচ্ছে? বলুন! কাতর স্বরেই সে বলে।

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের রাজনীতি, রাজোচিত চালটা বুঝতে পেরেছেন এতোক্ষণে, বুঝে বাহবাই দিয়েছেন মনে মনে। তিনি গোবর্ধনেরই অনুসরণ করেন—কেন, ঠিকই তো বলেছে ও! আসামের ঠিকানাই হলো আসল! আগে আসামে তো গিয়ে পেঁছোও—তারপর আমাদের বাড়ি খুঁজে বের করতে দেরি কি আর। তখন তোমার ঐ মন্তর ছাড়ো আর এনতার ওড়ো! চারধারে উড়তে থাকো—উড়তে উড়তে ঘুরতে থাকো—ঘুরতে ঘুরতেই চোখে পড়বে। কতো কাক-চিলই তো উড়ে গিয়ে বসছে আমাদের বাড়িতে, হরদমই বসছে, রোজই বসছে! কই তাদের তো ভুল হচ্ছে না কখনো!

কিন্তু একটা জায়গার নাম তো জানা চাই। উড়তে শুরু করবো কোত্থেকে?

ও! এই কথা? গৌহাটি! গৌহাটিই হলো গিয়ে আমাদের শহর। যেমন তোমাদের এই কলকাতা। ওড়বার পক্ষে শহরই প্রশস্ত নয় কি?

গৌহাটি? তাই বলুন! তা এতোক্ষণ বলতে হয়! গৌহাটির নাম শুনেছি বইকি! দাঁড়ান একটু, সম্রাটকে একটা টেলিফোন করে আসি! চলে আসছি এক্ষুনি!

বাঁটকুল লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যায়। কোনোদিকে দৃকপাত না করেই দৌড় মারে।

এই তালে পালাই, চলো। গোবরা দাদাকে পরামর্শ দেয়।

ছাদ দিয়ে? তোর ঐ মন্তর ফুঁকে? হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—বলেছি তো, ওসব ওড়া-টোড়া আমার পোষায় না বড়ো।

আহা, ছাদ দিয়ে কেন? উড়তে কে বলছে? সদর দরজা খোলাই তো রেখে গেছে ছোঁড়াটা। তাড়াতাড়িতে শেকল আঁটতে ভুলে গেছে। এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ! ও আসবার আগেই—

গোবর্ধন ভয়ে-ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নড়াচড়ার উদ্দীপনা খুব বেশি ছিলো না। একটু গড়াতে পারলেই যেন ভালো হয়, ওঁর মনে হচ্ছিলো কেবল। হলোই বা শত্রুর বিবর, কিম্বা মৃত্যুর কবর—ঘুমোতে কি হয়েছে? বাধাটা কোন্‌খানে? কিন্তু ভাইয়ের উৎসাহের ধাক্কায়, বৃহৎ বপু নিয়ে বাধ্য হয়ে ওঁকে দাঁড়াতে হয়, এবং হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে নিজেকে বাড়াতে হয় বাইরে।

এতো বড়ো বাগানবাড়িটা একদম খাঁ খাঁ! কেউ নেই কোথাও। এদিকে ওদিকে ঘুরে-ফিরে চুল চিরে দেখেন ওঁরা। গোবর্ধন পা বাড়িয়ে পালাতে ব্যস্ত ছিলো, কিন্তু হর্ষবর্ধন বিচক্ষণ, তিনি বলেছেন—না। কেউ কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে আছে কিনা দেখা দরকার আগে! না দেখে শুনে বোকার মতো দৌড়োই, আর পেছন থেকে তাড়া করে তাড়িয়ে এসে ধরে ফেলুক আর কি, আর তারপর মার লাগাক দমাদ্দম, তাহলেই তো সুখের চোদ্দপোয়া!—

হ্যাঁ, মার লাগালেই হলো! নাগাল পেলে তো! পালিয়ে যাবো না এক ছুট্টে!

না বাপু। ও-সব দৌড়ঝাঁপ আমার কম্ম না! আমি বাপু পারবো না তুড়িলাফ খেতে, আমি তোমাদের ঐ চ্যাংড়াদের মতো নই! আমরা হলাম সাবেক মানুষ। দৌড়ঝাপের ধার দিয়েই আমি যাই না। লাফ খাবার নামটিও করো না আমার কাছে! ওসব ফচকেমিতে আমি নেই। দৌড়োনো? বাবাঃ! সে হচ্ছে গাছে চড়ার চেয়েও খারাপ—ঢের ঢের খারাপ! তার চেয়ে আকাশে ওড়াও ভালো। ঢের ভালো, হ্যাঁ।

কিন্তু না ; যতোদূর খুঁটিয়ে সম্ভব, চারিধারে পরিদর্শন করে কয়েকটা কাঠবেড়ালী এবং কতিপয় উইচিংড়ে ছাড়া আর কোন জনপ্রাণীর তাঁরা পাত্তা পান না! দু-একটা টিকটিকি অবশ্য তাঁদের নজরে পড়ে, কিন্তু তাদের গোয়েন্দা জাতীয় বলে সন্দেহ করা চলে না। ইতরতার যথেষ্ট আভাস সত্ত্বেও তারা ইতর প্রাণীর মধ্যেই বিবেচ্য।

অতএব, দৌড় মারবার কোন বাধ্য-বাধকতা নেই। হর্ষবর্ধন চলেন, লম্বা লম্বা পা ফেলেই চলেন, অকুতোভয়েই গেট পার হন, গট্ গট্ করেই হেঁটে চলেন তিনি। টিকটিকি কি কাঠবেড়ালীর থেকে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা ছিলো না। আর উইচিংড়ে? জলজ্যান্ত একটাকে তো নিজের লেজে বেঁধে নিয়েই চলেছেন।

রাস্তাও নির্জন! মাঝে মাঝে এক-একটা মোটর হুস্ হুস্ করে চলে যায়! অনতিদূর থেকে ইঞ্জিনের হাঁস্‌ফাঁস্ ভেসে আসে, আবার, কোথাও সুদূরপরাহত হয়ে যায়। কাছে-পিঠে কোথাও দিয়ে রেলগাড়ির যাতায়াত আছে, আন্দাজ করা কঠিন নয়। দূরে দূরে কদাচিৎ পদাতিকের টিকি

যে না দেখা যায় তা না, কিন্তু ভালো করে পা চালিয়ে টিকির অতিরিক্ত বেশি কিছু দেখবার দুশ্চেষ্টা করতে গেলেই, সে-সব জনমানিষ্যি, আশে-পাশে, কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে পড়ে। বাতাসেই মিলিয়ে যায় নাকি, কে জানে!

অনেক দূর পর্যন্ত তাঁরা এগোন, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

থামাবো একটা মোটরকে? হর্ষবর্ধন বললেন হঠাৎ।

কি করে থামাবে? গোবরার বিস্ময় লাগে।

কেন, ফাস্‌টো বুকের লাস্‌টো চ্যাপ্‌টার হয়ে!

সে আবার কি, দাদা?

তোর একেবারে কিচ্ছু মেমারি নেইরে গোবরা। কি করে যে তুই টিঁকে আছিস তাই আমার তাক লাগে। আশ্চয্যি! সেই যেরে—একটা ছেলে—মানে একটা ছেলের ছবি সূর্যের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে—দু'হাত দু'দিকে লম্বা করে দিয়েছে—উত্তরে আর দক্ষিণে—মনে পড়ছে না তোর?

হ্যাঁ হ্যাঁ—গোবরার মনে পড়ে যায়—তা, কি হয়েছে তার?

হবে আবার কি! হর্ষবর্ধন বললেন—বলছিলাম এই যে, যদি সেই ছবির মতো হয়ে, রাস্তা জুড়ে দাঁড়াই, তাহলে কি মোটরগাড়ি থামাবে না, বলতে চাস? একটা না একটা থামবেই! আমাকে ভেদ করে যেতে পারবে না কিছু।

গোবর্ধন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে—উঁহু। ওসব ঝক্কি নিয়ে কাজ নেই দাদা! মোটর গাড়ির কি মর্জি হবে, কে জানে! হয়তো—আশঙ্কাটা সে ব্যক্ত না করে পারে না—ধাক্কাটাক্কা লেগে, ছবি ভেঙে যেতেও পারে।

হ্যাঁ, ভাঙলেই হলো! দেখেছিস একবার—কি রকম ছবি একখানা! ইয়া ছাতি! ইয়া ভুঁড়ি! যাকে শাস্ত্রে বলেছে শালপ্রাংশু মহাভুজঃ! এ-ছবি আর ভাঙতে হয় না! নিজের দিকে তিনি গোবরার এবং স্বয়ং নিজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে হ্যাঁ, ফ্রেমট্রেমের কথা বলা যায় না। মোটরের ছোঁয়া লাগলে ওসব গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে বটে। তা, তুই না হয় একটু দূরেই থাকিস।

গোবরাকে তিনি নিতান্তই একটা ফ্রেমের মধ্যে গণ্য করেন—আস্ত একখানা কাঠের ফ্রেম—ফ্রেম-আপ্—তাছাড়া আর কি?

গোবরা কিন্তু তর্কাতর্কির মধ্যে যায় না। হর্ষবর্ধন ক্ষেপতে কতোক্ষণ? দাদাকে তার জানা আছে। এবং এই বিপদসংকুল মুহূর্তে, যে অসময়ে দাদার ছবি হবার দুর্দমনীয় অভিরুচি, সেই সংকটক্ষণে, দাদাকে এবং নিজেকে—ছবি ও ফ্রেম একাধারে সামলে রাখাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। ঠিক যে ফ্রেমের মায়াতেই সে পিছিয়ে যায়, তা নয়, ছবির প্রতিও একটা

অনির্বচনীয় টান অকস্মাৎ সে অনুভব করে। ছবি ছাড়া কি ফ্রেম থাকতে পারে?

তার চেয়ে বরং ঐ সাইকেলওলাকেই আটকাও—সে অন্য বুদ্ধি বাতলায়—তাহলেই হবে।

যদি যায়, অল্পের ওপর দিয়েই যাক, এই তার মতলব।

পথের মধ্যে হঠাৎ, যারপরনাই বাহুবিস্তার দেখে সাইকেলওয়ালা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—কি? ব্যাপার কি? বাঘ বেরিয়েছে?

বাঘ! জানিনে তো! হর্ষবর্ধনের পিলে চমকে যায় শুনে, আজ্ঞে—একটা কথা জিগ্যেস করছিলুম! বলছিলুম কি, যে দিল্লী আর কদ্দুর?

দিল্লী। দিল্লী কেন? বেলগেছেয় বসে হঠাৎ দিল্লীর খোঁজ কেন? লাড্ডু টাড্ডু দরকার পড়েছে নাকি?

আজ্ঞে না—এবার গোবরা যোগ দেয়—এখান থেকে দিল্লী কদ্দুর, সেটা জানতে চাইছিলাম। সেইদিকেই চলেছি কিনা আমরা!

রাঁচি থেকে রওনা হয়েছেন বুঝি? তা দিল্লী এখনো দূর আছে—সাইকেলওয়ালা প্যাড্‌লিং শুরু করতে করতে বলে—এখান থেকে দিল্লী—তা বেশ খানিকটা দূরই বই কি!

সাইকেলওয়ালা চলে গেলে হর্ষবর্ধন রেগে ওঠেন, হঠাৎ খামোখা কি মুস্কিল বাধালি দেখ দিকি! চুরি গেছলাম ভালো গেছলাম, পদে ছিলাম তবু—পালাতে গিয়ে কি বিপদে পড়া গেলো দেখ তো! কি সব ঝঞ্ঝাট ডেকে আনলি দেখ দিকি! এখন কোথায় দিল্লী তার ঠিক নেই, রাস্তা-ঘাটও অজানা, এধারকার লোকগুলোও সুবিধে নয়—লোকের পাত্তাই নেই তো লোক! তার ওপর আবার বাঘ বেরিয়েছেন দয়া করে! এইবার আর কি, সবংশে বাঘের পেটে গিয়ে হজম হয়ে বসে থাকা যাক। ব্যস্‌!

এই বিদেশ-বিভুঁয়ে, বেঘোরে মারা যাবার তথ্যটা যতোই গভীর করে হর্ষবর্ধনের অন্তর্গত হতে থাকে, ততোই তিনি আরো খাপ্পা হয়ে ওঠেন! রেগে-মেগে, গোবরাকে উজবুক উপাধি দিয়ে ফেলতেও তাঁর দ্বিধা হয় না।

দেখ তো! কী ফ্যাসাদ বাধালি দেখ দিকি। লোকে প্রাণ নিয়েই পালায়, পালাতে গিয়ে কেউ আর প্রাণ দেয় না! কিন্তু এ কী করলি দেখ তো? ছ্যা—ছ্যা!

হর্ষবর্ধনের ধিক্কৃতি এবং মুখবিকৃতির আর অন্ত থাকে না। বললেন সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় আর বলেছে কেন? বিটকেলের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে এখন বাঘের মুখে মরতে হলো! এরকম দুর্দশার চেয়ে বিটকেলের গুঁতোও যে ভালো ছিলো, বাপু। পেটে খেলে পিঠে

সয়, কথায় বলেছে ; কিন্তু এখন বাঘের পেটে গেলে আর কোথায় সইবে? শুনি?

গোবর্ধন কি বলবে? এসব অভিযোগের কি জবাব আছে? প্রাণ তো যেতেই বসেছে, সেজন্যে আর মন খারাপ করে লাভ কি, তর্কাতর্কিতেই বা কি ফল? খোয়া যাবার মুখে, যতোটা সাধ্য, দাদার বাধ্য হয়ে দাদাকে খুশি করতেই সে চায়। দাদার কথায় সায় দিয়ে সান্ত্বনাদানের চেষ্টাই সে করে—বাঘে ছুঁলে আবার আঠারো ঘা! জানো তো দাদা?

একে এহেন দুর্ভাবনার উত্তাপ, তার ওপরে আবার টিপ্পনির ফোড়ন-কাটা, হর্ষবর্ধনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি চড়বড় করে ওঠেন—হ্যাঁ, ঘা বানাতেই আসছে কিনা তারা! ছুঁয়েই ছেড়ে দেবে কিনা! তোর মতোই হাঁদা কিনা বাঘগুলো? আগে গিলে বসে, তারপরে তাদের অন্য কথা! বাঘ বলেছে কেন তবে? বাগে পেলেই হলো! ব্যস! আর হুঁ-হাঁ নেই! হুম!

হুম নয়, হালুম! গোবরা আবার কথা বলে—হালুম! আর গেলুম!

হর্ষবর্ধনের ইচ্ছা করে, বাঘের আশু প্রয়োজনীয় ভূমিকাটা বিকল্পে, তিনিই অভিনয় করে বসেন। আঠারো না হোক কয়েক ঘা অন্ততঃ তক্ষুনি খাইয়ে দেন গোবরাকে।

এক্ষুনি একটা বাঘ বেরিয়ে এসে তোকে ধরে আর গেলে কোঁৎ কোঁৎ করে—আমি দেখি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আমি। তোর মতো পাঁচটাকে খেলে তবে আমার আনন্দ হয়!

সুখাবহ শোচনীয় দৃশ্যটাকে তিনি কল্পনায় হৃদয়ঙ্গম করে উপভোগ করেন।

তাতো হবেই!—গোবর্ধনের ক্ষুণ্নস্বর—হবে না কেন? সীতাকে বনবাসে রেখে এসেছো, এখন লক্ষ্মণ বর্জন করলেই তো সুখের তোমার চোদ্দ পোয়া! তার চোখের দৃষ্টিও অক্ষুণ্ণ থাকে না, অশ্রুবাষ্পে ভরে ওঠে।

যা—যাঃ! ভারি আমার লক্ষ্মণ এসেছেন! তুই গেলে আমার একটা দর্লক্ষণ যায়। এরকম পদে পদে মরতে হয় না আমাদের। আর তোর বৌদিও কিছু সুলক্ষ্মণা নয়! যা বলবো, হক কথা। সীতা বলতে হয় তুই বলগে যা, যতো তোর প্রাণ চায়—আমি ওকে সূর্পনখাও বলতে পারবো না! মন্দোদরীও না, হিড়িম্বাও না।

বাড়ি ফিরে আমি ঠিক বলে দেবো বৌদিকে।

হর্ষবর্ধন ভয় খান না, বলেন, জানা আছে আমার। তোর মনে থাকলে তো তদ্দিন। মেমারিই নেই তোর, যে মহামারী বাধাবি।

আমি মুখস্থ করে ফেলছি এক্ষুণি! গোবর্ধনের ঘন ঘন ঠোঁট নড়তে থাকে। কী কী উপমা বৌদিকে দিতে দাদা একেবারেই নারাজ, সেই

অনুপম বিশেষণদের সমস্ত তালিকাটা সম্পূর্ণ নিজের উদরস্থ করবার দুরূহ অধ্যবসায়ে সে উঠে পড়ে লেগে যায়।

স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে। হর্ষবর্ধন গজ গজ করেন, শাস্তর কি আর মিথ্যে বলে? না তোর বুদ্ধি শুনি, না আজ এমন বেঘোরে মরি!

আমি বুঝি স্ত্রী? গোবরা এবার প্রতিবাদ না করে পারে না, মেয়েছেলে বুঝি আমি!

মেয়েছেলে হলেও রক্ষে ছিলো! তুই মেয়েরও অধম। বলেই তো দিয়েছি, তুই একটা নার্তনি! মানুষের মধ্যেই ধর্তব্য না।

হর্ষবর্ধন আর কালবিলম্ব না করে দিল্লীর উল্টো দিকে লম্বা পা ফেলতে শুরু করে দেন। বাঘের আহার্য হবার আগে পায়ের সাহায্য নেওয়া—যতোক্ষণ পর্যন্ত ওগুলো আস্ত আছে এবং পেটের মধ্যে সেঁধোয়নি, মানে, বাঘের পেটের মধ্যে—তাকে চালানোই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে তাঁর ধারণা হয়। তিনি পা চালিয়ে চলেন, তীর বেগেই চলেন, ষ্টিম রোলার যেমন তীরবেগে চলে, প্রায় তেমনি ক্ষিপ্রগতিতে—মাঝে মাঝে ডানদিকের ঘাড় ঈষৎ কাৎ করে দেখে নেন—নাঃ, গোবরা ঠিক ছায়ার মতোই অনুসরণ করছে বটে—দুর্লক্ষণের মতোই হুবহু!—এবং তার বাঁ দিকের আধখানা মুখ থেকে মৃদুমন্দ হাসি স্বতঃই বিস্ফারিত হয়ে বহির্গত হতে থাকে।

এদিকে বিটকেল-সম্রাটের রাজধানীতে দারুণ হৈ চৈ! বাঁটুকুল টেলিফোন করে ফিরে এসেই দেখে, সদর গেটে এক জটিল জটলা! হর্ষবর্ধনরা উধাও হয়েছেন, জানতে তার বেশি দেরি হয়না।

আমি তো গেছলাম ফোন করতে, তোমরা সব গেছলে কোথায়? বাঁটুকুল কৈফিয়ৎ চায়—কোন চুলোয়?

আমি তো এইমাত্র ফিরছি! সোফার বলে—সম্রাটকে পেঁছে দিয়ে আসছি এই! এসেই দেখি এই কান্ড!

ঝক্কম্‌ঝক্কা, তুমি? তুমি কোথায় গেছলে দারোয়ানজি? বাঁটুকুলের তিক্ত স্বর।

দরোয়ানজির ভগ্ন কণ্ঠের সঙ্গে ভাঙা বাংলা সংমিশ্রিত হয়ে যা বেরোয় তার মর্ম—তার পাশের বাড়ির বন্ধু লটপট সিং-এর নিকট ডলিত খৈনির প্রত্যাশাতে সে একটুক্ষণের জন্যই গেটকে ছেড়েছিলো। লটপট সিংও ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত ছিলো না, ঝক্কম্‌ঝক্কার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সেও সাফাই দেয়।

খৈনি খেতে গেছো! তবে আর কি মাথা কিনে নিয়েছো আমার! বাঁটুকুল রাগের চোটে তিড়িং মিড়িং করে লাফাতে থাকে—আর তুমি?

মালি বাবাজীবন? তুমি কেন কেটে পড়েছিলে? কি খেতে শুনি?

মালি, ঠিক কিছু খেতে নয়, তবে খাদ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারেই বিজড়িত হয়ে, কিছুক্ষণের জন্য কাছাকাছি অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছিলো, স্বাভাবিক সঙ্কোচ কাটিয়ে, সেই কথাটা কবুল করে বসে। আর কিছু নয়, কতকগুলো পেয়ারা কেবল! এই করেই সেইগুলো সঞ্চয় করে বেলগেছের বাজারে—হ্যাঁ, তা বাঁটকুলবাবু যদি তাকে বামাল সরানো বলেন, কি চোরাই মাল বেচাই বলেন—সে আর কী বলবে? মালির দিনরাত হাড়-ভাঙা খাটুনি তো কেউ আর দেখে না। কখন দুটো তলায়-পড়ে-থাকা পেয়ারা কুড়িয়ে, তাকে পয়সায় বাড়িয়ে, পান-দোক্তায় পরিণত করবার চেষ্টা করেছে, সেইটাই খালি লোকের চোখে পড়ে। দারোয়ান যদি দ্বার ছেড়ে খৈনির তালে যেতে পারে তাহলে তার মালি থেকে বামালি হওয়াটাই খুব দোষের হয়েছে কি!

বেশ তোমরা গিয়েছিলে তো দরজাটা লাগিয়ে যেতে হয়েছিলো কি? বলি, দরজা তো একটা আছে? দরজাটা আছে কি জন্যে?

বাঁটকুলের এই জিজ্ঞাসার জবাবে কেউই কিছু বলতে পারে না,—দরজাটাও না!

এমনই উৎকণ্ঠার সময়ে, হর্ষবর্ধন বীর সেনানায়কের মতো ধীর পদক্ষেপে, পশ্চাদ্বর্তী গোবর্ধন-রূপ বিরাট সৈন্যবাহিনীকে অদৃশ্য আঙুলি-হেলনে অবহেলায় চালিত করে একেবারে তাদের মাধ্যখানে এসে পড়েন।

বাঃ, কোথায় গেছলেন মশাই আপনারা? আচ্ছা লোক বটে! বাঁটকুল আকাশ থেকে পড়ে, কিম্বা, আকাশেই সোজা উঠে পড়ে—সেই পরমাশ্চর্যের মুহূর্তে সঠিক সে বুঝতে পারে না।

হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম, বেড়াচ্ছিলাম একটু। হর্ষবর্ধন গম্ভীর কণ্ঠে বলেন্—কেন, হাওয়া কি খেতে নেই? হয়েছে কি?

না, না, হয়নি কিছু। কি হবে? বাঁটকুল সামলে নেয়—আপনাদের বেড়িয়ে ফেরার অপেক্ষাই করছিলাম আমরা। কখন ফিরবেন সেই কথাই হচ্ছিলো আমাদের।

ফিরতে আপনাদের দেরি হচ্ছিলো কি না! সোফার বলে।

দেরি? এ আর এমন কি দেরি হয়েছে?

হর্ষবর্ধনের অভিযোগ হয়—আমার এই লক্ষ্মণ-ভায়ার পরামর্শ শুনলে দেরি কাকে বলে বুঝতে পারতে! এজন্মে ফিরতেই পারা যেতো কি না সন্দেহ।

এতোক্ষণ হয়তো বাঘের পিঠে চেপে—পিঠে? উঁহু, বাঘের পেটে চেপে জঙ্গলে-জঙ্গলেই ঘুরছি! গোবরার কথা বেরোয়।

ঝক্কম্ঝক্কা তক্ষুনি, আর দেরি না করে, বন্ধু লটপট সিং-এর বাহু-বলের সাহায্যে, সেই বিরাটকায় গেটের প্রকাণ্ড পাল্লা দুটো ভিড়িয়ে, তাতে পেল্লায় এক তালা লাগিয়ে দেয়, সেই দণ্ডেই।

রাম বলো, লটপট সিং! বলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। রাম রাম, বলো ভাইয়া।

নেহি নেহি, ঝক্কম্ঝক্কা! রাধাকিষণ বোল্না চাহিয়ে!

হর্ষবর্ধন বলেন—হ্যাঁ, ভালো করে দরজাটা এঁটে দাও বাপু। যেন একটুও ফাঁক না থাকে কোথাও। বাঘ বেরিয়েছে কি না! আস্ত বাঘ, বুঝেছো?

বাঘ কেনো বাবুজি, ইস্দফে কোই বিল্লি ভি বাহার্তে সেক্বে না! সীয়ারাম! সীমায়রাম! বলে সে ভয়ানক আরামের হাসি হাসে।

হাথি কোভি নিকাল্না মুস্কিলই হ্যায়? হর্ষবর্ধনের দিকে লক্ষ্য করেই লটপট সিংয়ের এই হাতিমার্কা কটাক্ষ?

হাতি কো বাৎ তো হচ্ছে না পাঁড়েজি!—হর্ষবর্ধন লটপট সিংহকে বোঝাতে চেষ্টা করেন—বাঘকো কেয়া বোলতা হিন্দিমে? শের? ঐ শের বাহার হয়েচে।

শেরের বাহার সিং-শাবক কতোখানি বোঝে, সেই জানে, কিন্তু গোবরা দাদাকে আশ্বস্ত করে—শের শের কি বাজে বকছো দাদা? গেটের কোথাও এক চুল ফাঁক আছে নাকি? একটা আধসের গলাও শক্ত, তা সের?

যাকগে। যেতে দে! বাঘের পেটের চেয়ে নিজের পেটের ভাবনা ভাব আগে...বৎস বাঁটকুল! বাঁট্কুলচন্দ্র! শোনো। এদিকে এসো তো। এই বলে হর্ষবর্ধন বুকপকেটের কোণ থেকে ঘামভেজা একখানা কাগজ টেনে বার করেন—এই নোটখানা নাও! আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করো তো বাপু! খিদেয় নাড়ি চিঁ চিঁ করছে। গোবরার কি! ও তো নারীর অধম। খিদের বালাই নেই ওর। বাবাঃ! সকাল থেকে কি কম হয়রান-পরেশান গেছে? যাও তো বাবু ছেলে, কিছু খাবার-টাবারের যোগাড় দেখো তো আগে।

জড়ীভূত নোটখানাকে বিমুক্ত করতে করতে বাঁট্কুল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—এ যে একশো টাকার নোট! বাঃ!

কেন, ওতে কি কুলোবে না?

এতো কি হবে? দু-তিন টাকাই ঢের! সাতানব্বই টাকা ফেরতা আসবে।

দোহাই বাপু, আর যাই করো, ফেরতা টেরতা এনো না। ওতে আমরা ভয় পাই, ভারি দমে যাই আমরা। আমাদের জানা আছে টাকাকড়ির কখনো ফেরতা আসে না—ওদের হচ্ছে অগস্ত্য-যাত্রা! কর্পূরের মতোই

কেমন করে যেন উপে যায় ওরা! তা, অপরের হাতেই কি, আর নিজের হাতেই কি! ওদের একবার এহাত থেকে ওহাত, মানে বেহাত হলেই হলো?

এতে আপনাদের একমাসের খরচ চলেও অনেক বেঁচে যাবে—আমি বলছি।

এই সেরেছে! হর্ষবর্ধনের চোখে-মুখে বিভীষিকা প্রকট হয়ে ওঠে—বলছি না, যে বাঁচাতে হবে না? বাঁচিও না একদম। টাকা বাঁচালে মানুষ মারা পড়ে—তা জানো? টাকা মেরেই মানুষ বেঁচে থাকে। আধমরা হয়ে টাকা বাঁচিয়ে লাভ? তার চেয়ে যে টাকা বাঁচবে, তোমার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি—তুমিই মেরে দিও।

আমি বুঝি, মেরেছি আপনার টাকা? বাঁট্‌কুল গজগজ করে।

আহা, রাগছো কেন? টাকার আবার আমার-তোমার কি? টাকা হচ্ছে সবার। টাকার আমদানী-পথটা খোলা রেখে, যাবার পথটা বেশি পরিষ্কার করতে হয়। ও এমনি জিনিস, অনেকটা হাওয়ার মতোই, ফাঁকা পেলেই এসে ঢুকবে আর ফাঁক পেলেই বেরিয়ে যাবে। যাতায়াতের পথ না পেলেই ওর মুস্কিল—জমে গেলেই বিভ্রাট! এনতার আনো আর এনতার ওড়াও।

আপনি তো বললেন, আনো। আসে কোত্থেকে? বাঁট্‌কুল আফশোষ চাপতে পারে না। দিচ্ছে কে?

এই যে আমিই দিচ্ছি। বলেছি তো, ওর থেকে যা ফেরত আসবে সব তোমার। যতো খুশি ওড়াও! উড়িয়ে দাও, চারধারে ঘুরিয়েও দিতে পারো।

কি করে ঘোরাবো? কার হাতে ঘুরিয়ে দেবো? আপনারাও তো ঘুরিয়ে নিচ্ছেন না। তাহলে?

আহা ঘুড়ি কিনে কিনে ঘুরিয়ে দাও না হে? ঘুরিয়ে দেওয়াও হবে—উড়িয়ে দেওয়াও হবে।

আমি ওড়াবো না, ঘোরাবো না, জমিয়ে রাখবো। বাঁটকুল জানায়।

সর্বনাশ করেছে—। হর্ষবর্ধন পকেট থেকে আরেকখানা বৃহদাকার নোট বার করেন—এটা হচ্ছে হাজার টাকার। এইটাই ওড়াও তবে! কিন্তু আর কিছুই রইলো না আমার কাছে। এক টাকাও না। উড়িয়ে দিলুম সব। এমনি করেই টাকা ওড়াতে হয়, তবেই টাকা আসে। তবে হ্যাঁ, রোজগার করে ওড়ানো চাই।

বাঁট্‌কুল আনন্দে আত্মহারা হয়ে হর্ষবর্ধনের গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে—আপনি ভারি ভালো লোক। সত্যি! ভারি ভালো!

এই? ওকি হচ্ছে?—গোবরা ফোঁস করে ওঠে—আমার দাদার গায়ে হাত দিচ্ছো যে বড়ো? ওকি? ওসব কি। বাঁট্‌কুলের আহ্লাদে-ব্যবহার

ভালো লাগে না গোবরার—ওর চেয়ে দুর্ব্যবহারও অনেক ভালো। অনেক বেশি সহনীয়—অন্ততঃ গোবরার পক্ষে।

আহা! দিক না। ছেলে মানুষ, কী হয়েছে? একটু আদর করছে বইতো নয়? আমি কিছু আর ক্ষয়ে যাবে না তাতে? হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে থামান।

ব্যস? নাই দিচ্ছো, যো পেলে আর কি! এইবার মাথায় উঠে বসবে! দেখো।

বসলোই বা। কী আর হয়েছে। ছেলে মানুষই তো। খুব বেশি ভারি নয়তো আর। আমি কিছু ভেঙে পড়বো না তাতে। তুই যে ছেলেবেলায় কতো আমার কাঁধে চাপতিস—মনে নেই তোর? আমি কি কিছু বলেছি?

দাদার এই অপক্ষপাত গোবরার প্রাণে লাগে। সে আর বাঁট্‌কুল সমান হলো? দাদা যে সত্যিই পর হয়ে যেতে বসেছে তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না। দুটো চোখই সজল হয়ে ওঠে ওর।

বেশ, থাকো তুমি ঐ ভরতের বাঁটুল আঁকড়ে। লক্ষ্মণ চললো। বৌদির কাছেই চললো লক্ষ্মণ!

গোবর্ধন বাড়ির ভেতরে ঢুকে তর্‌ তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। সটান ছাদেই গিয়ে ওঠে।

বৌদি ওখানে এসেছে নাকি? বাঁট্‌কুলের বিস্ময়াকুল জিজ্ঞাসা।

বৌদি? ওই ছাদে? আমার যদ্দুর মনে হয়, বৌদি—মানে ওর বৌদি—এখানে নেই। সে এখন সুদূর আসামের আরেক ছাদে। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

তাহলে উনি যে এই ছাদে গেলেন, তাঁকে খুঁজতে?

ছেলেমানুষ! মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বুঝছো না! ছেলেমানুষদের কি আর মাথা আছে। মাথাই নেই তো খারাপ হতে কতোক্ষণ? হর্ষবর্ধন উদাহরণের দ্বারা তথ্যটাকে আরো বিশদ করে দেন—এই যেমন তুমি একটা ছেলেমানুষ! বলা নেই, কওয়া নেই, আমার গলা ধরে ঝুলে পড়লে হঠাৎ। ও আবার তেমনি আরেক ছেলেমানুষ। ওর তাইতে অভিমান হয়ে গেছে! আর কারো গলা না পায় তো, ছাদে গিয়ে, নিজের গলাতেই ফাঁস দিয়ে নিজের গলা ধরেই ঝুলে পড়বে কিনা, কে জানে!

হর্ষবর্ধনের ভাবনাই হয়—এবং ভাবতে না ভাবতে এক মুহূর্তেই তিনি প্রচণ্ড দুর্ভাবনায় পরিণত হয়ে পড়েন, বলেন—যাও তো, যাও তো বলো গে ও-ও না হয় আমার গলা ধরে ঝুলুক খানিক। কি আর করবো? ও ঝুলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যাই আবার! এখন তো আর অ্যাট্‌টুকু নেই। ভারি হয়েছে অনেক। তা যা হয় হবে, না ঝুলে কি ঠাণ্ডা হবে ও? চটপট যাও। সামলাও গিয়ে ওকে, আগে।

এই দেহ নিয়ে ছাদে উঠতে হলে তিনঘণ্টা লেগে যাবে আমার। আমি আবার লাফাতে লাফাতে কোনো কাজই করতে পারি না, ছাদে লাফিয়ে উঠতে হলে তো গেছি।

ততোক্ষণে গোবর্ধন এসে, কার্ণিশের ধার ঘে'সে, নিচের সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তড়বড় করে ঠোঁট নড়ছে তার—টা টি টুক্‌মুক্‌ টেন্‌ অ বাটায়!—দুর্দান্তভাবে আউড়ে চলেছে সে।

পরমুহূর্তেই, নেহাত-শূন্যমার্গ লক্ষ্য করে তার প্রচণ্ড এক লাফ! পাখিদের মতো ওড়বার অভিলাষে ঠিক হনুমানদের হুবহু নকল!

যা ভেবেছি তাই! একটা গাছই বটে। আমার আন্দাজে ভুল হয়নি, ঠিকই ধরতে পেরেছি। যে-রকমটি সচরাচর সব গল্পের বইয়েই হয়ে থাকে।

এরকম ক্ষেত্রে একটা গাছ না থেকেই পারে না!

হনুমানের অনুকরণ করতে গিয়ে গোবর্ধন যে সময়ে মাধ্যাকর্ষণের অনুসরণ করছে—অবিকল নিউটন-পরিদৃষ্ট সেই আপেল-ফলটির মতোই—সেই সময়ে মাঝখান থেকে বাধা আসে। মধ্যপথে বাগড়া পড়ে; এই মারাত্মক মুহূর্তে যে ভুঁইফোড় গাছটা গোবর্ধন আর পৃথিবীর মাঝখানে মধ্যস্থতা করেছিলো, তারই একটা ডালের ফ্যাকড়ায় গোবরার কাছা আটকে যায়।

কারণ? কারণ আর কিছুই নয়, গল্পের এ'রা তো আর সহজে মরবার পাত্র নন। অতএব গল্পের খাতিরেই, গাছের সঙ্গে লটকে গিয়ে ঝুলতে থাকে গোবর্ধন।

ভাগ্যিস ওর হিন্দুস্তানীদের মতো আঁটসাঁট কাপড় পরবার বদভ্যাস, তাই সে কোনো গতিকে টি'কে থাকে।

কিন্তু এরকমভাবে কতোক্ষণ আর টে'ক্‌সই থাকা সম্ভব? হর্ষবর্ধন ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই এই! তোমরা দেখছো কি? পড়ে মারা যাবে যে!

সকলেই হাঁ করে সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখছিলো। এতোক্ষণে হু'স হয়, এবার সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে। বাঁটুকুল একজনকে মোটা দেখে একটা দড়ি আনবার হুকুম দেয়।

দড়ি কি হবে? হর্ষবর্ধন তো অবাক।

কূপ থেকে যেমন করে ঘটি তোলে, তেমনি করেই টেনে নামাতে হবে তো? আটকে গেল যে, দেখছেন না? আমরা দড়ি ছু'ড়ে দিই আর উনি দড়িটা ধরে ফেলে, গলায় কিংবা কোমরে বে'ধে ফেলুন—আর আমরা সবাই মিলে এক হ্যাঁচকায় নামিয়ে আনি!

বাঃ, আর আছড়ে পড়ে হাত পা ভেঙে যাক ওর! বেশ আর কি? হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন।

তবে আর অন্য কী উপায় আছে? ড্রাইভারটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে এবার।

উঁহু, কূপের ব্যাপার না! মানুষ পুকুরে কি নদীতে ডুবে গেলে কি করা হয়? তাই করতে হবে। হর্ষবর্ধন বুঝিয়ে দেন ভালো করে—সেখানে লাফিয়ে গিয়ে জলে নামতে হয়, আর এখানে কেবল লাফিয়ে গিয়ে উঠতে হবে। ঐ গাছেই উঠতে হবে।

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। গাছে ওঠার উৎসাহ হয় না কারো। এক বাঁটকুল ছাড়া, গাছে উঠতেই কেউ জানেনা ওদের মধ্যে। জানলেও, যে কারণেই হোক, জান দিতে রাজি নয়, জান যাবার ভয় আছে তো! তবে সাঁতার অবশ্য কারো কারো জানা আছে, কিন্তু তাতে কি আর সুবিধে হবে!

বাঁটকুল বলে—বলুন, এক্ষুনি আমি উঠে যাচ্ছি! কিন্তু উনি তো আর ছোট্ট আমটি নন যে, আমি গিয়ে পেড়ে আনতে পরেবো? বলুন, বললেই আমি উঠি। একবার ঘাড় নাড়লেই হয়, আদেশের কেবল তার অপেক্ষা।

উঁহুহু! তোমার কর্ম না! হর্ষবর্ধন বলেন—হাতের চেয়ে আম বড় যে! পারবে কেন তুমি? আমই বা কেন, গোবরাটা যা ভারি, পেল্লায় একটা কাঁঠাল কি তরমুজেরও বাবা বলা যায় ওকে। ওকে পাড়তে গেলে তুমি মারা পড়বে।

গোবর্ধন প্রাণান্ত প্রয়াসে—কিম্বা একান্ত অনায়াসেই—নিজেকে এতোক্ষণ ঝুলিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু ঝুলনযাত্রা তো কিছু আর অনন্ত কাল চলতে পারে না? তার কাছার ধারণশক্তি যে ক্রমশঃই বেশ কমে আসছে, হৃদয়ভেদী এই রোমাঞ্চকর রহস্য ভালো করেই সে টের পেতে থাকে।

করুণ কণ্ঠে এই ভয়াবহ তথ্যটি সর্বজনসমক্ষে সে উদ্ঘাটিত করে—দাদা, আর—আর বেশিক্ষণ না, কাপড় ফাঁসলো বলে। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও দাদা। তোমার দিব্যি, বৌদির দিব্যি আর কক্ষনো আমি উড়বো না।

আমাকেই উঠতে হলো, দেখছি। অগত্যা হর্ষবর্ধনকে মরীয়া হতে হয়। আর কি কেউ গাছে উঠে ওকে পাড়তে পারবে? ওর টাল সামলানো কি অতো সোজা? উঃ, সকাল থেকে কি ঝঞ্ঝাটটা না যাচ্ছে আজ! তিনি মালকোঁচা মারতে শুরু করেন।

বাধা আসে মালির তরফ থেকে। আর্তকণ্ঠে সে ককিয়ে ওঠে—বাবু-

মশাই, অমন কাজটি করবেন নি। গাছটি মারা পড়বেক তাহলে! আপনার ভার কি কি সইতে পারবেক ও?

অবোলা জীবের পক্ষ নিয়ে মালিকে ওকালতি চালাতে হয়। এই পেয়ারা গাছটা ওর আবার ভারি পেয়ারের গাছ।

এই নামমাত্র গাছটা ওঁর গুরুভার বহন করতে পারবে কি না—সে-রকম দায়িত্ববোধ ওর আছে কিনা আদপে—এমনকি, তাঁর দায় ঘাড়ে নেবার পর ওর স্থায়িত্ব সম্বন্ধেই হর্ষবর্ধনের সন্দেহ ছিলো।

লটপট সিং একটা বুদ্ধি বার করে। প্রস্তাব করে যে তার মাথার পাগড়িটাকে খুলে চারজনে চার ধার শক্ত করে বেশ টান করে ধরুক, আর গোবর্ধনবাবু গাছ থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়ুক।

হর্ষবর্ধন তার তারিফ না করে পারেন না—লটপট সিং, তোমার মাথায় কেবল পাগড়ি নেই, বুদ্ধি ভি আছে বহুৎ। চটপট বিছাও পাগড়ি! ভাই হামারা গিরনে লাগা।

হর্ষবর্ধন, দুই দরোয়ান আর বাগানের মালি পাগড়িটা বিছিয়ে তার চার খুঁট বেশ শক্ত করে তুলে ধরে আর শ্রীমান গোবরা অবলীলায় তার ওপরে লাফিয়ে পড়ে।

পড়েই আবার সে লাফিয়ে ওঠে, ঠিক নিজের ইচ্ছায় নয়। ফুটবল যেমন মাটিতে পড়ে স্বভাবতই লাফায় অনেকটা সেইরকম। লাফিয়ে উঠতেই হর্ষবর্ধন ভাইকে লুফে নেন—কি জানি যদি, আবার গাছে উঠে যায়।

গোববর্ধনও দাদার কোলে চড়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরে।

বাঁটকুল লাফাতে থাকে।

প্রথম থেকেই সে বেজায় রকম লাফাচ্ছিলো! এহেন পতন-লীলা তার খুব মনের মতন, কিন্তু দুঃখ এই যে, প্রায়ই ঘটে না, কিম্বা ঘটলেও আড়ালে-আবডালেই হয়ে যায়, চোখের সামনে কদাচই ঘটে থাকে। আনন্দ আতিশয্যে এসে ঠেকলেই বাঁটকুলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, স্বভাবতঃই, না লাফিয়ে সে স্থির থাকতে পারে না।

গোবর্ধন পেয়ারা গাছ থেকে অবতীর্ণ হলেও, ভূমণ্ডলে, তখনো ঠিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি—দাদার বেয়াড়া গাছেই অবস্থান করছে! কষ্টেসৃষ্টে সেইখানে বসেই সে বাঁটকুলের লম্ফ ঝম্ফ চেয়ে দেখে আর রোষকষায়িত নেত্রে তাকায়।

অবশেষে সে আর থাকতে পারে না—আর লাফাতে হবে না, থামো—এই বলে সে নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়ে—দাদার বাধা না মেনেই। বিরক্তি-পূর্ণ কণ্ঠ থেকে ঝাঁঝালো সুর বেরিয়ে আসতে থাকে—ভারি ভারি ওঁর মন্ত্র! টা টি টুক্‌মুক্—দূর দূর! মন্ত্র না কচু! উড়তে গিয়ে মাঝখান

থেকে পিঠ পেট টাটিয়ে গেলো! প্রাণ নিয়েই টানাটানি আমার! টা টি না ছাই! সে বলে। মনুক্তকণ্ঠেই বলে।

মন্ত্র না কচু, এই বলেই গোবরা থামে না, একটু পায়চারি করে হাত-পা-র আড় ভেঙে নিয়ে আবার সে যোগ করে, মন্ত্র না ঘেঁচু!

তোকে মারবার ষড়মন্ত্র! বুঝেছিস গোবরা! বাজে মন্ত্র দেবার জন্যে, হর্ষবর্ধনও বাঁট্‌কুলের ওপর চটে গেছলেন।

অনেকক্ষণ আগেই, দাদা! আজ সকালে যখনই ঐ শ্রীমূর্তি দেখেছি তখনই টের পেয়েছি। তার ঢের আগেই, যখন আজকের আনন্দবাজার পড়েছি, তখনই!

আস্ত একখানি নোট! পঁচানব্বই হাজারের একখানা! হর্ষবর্ধন আনন্দবাজারের সর্বোচ্চতম সংবাদটি স্মরণ করিয়ে দেন, তবে বাঁচলে হয়!

বাজে মন্ত্র? বটে? বললেই হলো, আর কি!—বাঁট্‌কুল এবার প্রতিবাদ করে—টা টি টুক্‌মুক্‌—ওই যাঃ! হয়েছে! একটু ভুলই হয়েছে বটে! ওটা ওড়বার মন্তর নয়, ওটা তো ব্যাঙ-লাফের মন্তর গো। তাই! সেই জন্যেই!

ব্যাঙ-লাফের মন্তর! গোবর্ধন দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে পড়ে যেন।

ব্যাঙ-লাফের মন্তর! অবাক করলে বাপু!—হর্ষবর্ধনও বিস্মিত হন—ব্যাঙেরা তো এমনিতেই লাফায়, নিজে থেকেই লাফ মারে, এই তো জানি! তাদের আবার মন্তর লাগে নাকি লাফাতে?

এই যে, এই রকম। বাঁট্‌কুল এবার উদাহরণের দ্বারা দেখাতে যায়—টা টি টুকমুক টেন অ বাটায়—

মন্ত্র পড়ে, আর ব্যাঙের মতো এগোতে থাকে। এবং গোবর্ধন বড়ো বড়ো চোখ বার করে বাঁটকুলের ব্যাঙ-লাফানো দেখে। একেবারে আসল ব্যঙ্গ রচনা! মন্ত্রশক্তির কীর্তি আর অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

লাফাতে লাফাতে হর্ষবর্ধনের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে বাঁটকুল। তিনি অমনি আঁৎকে উঠে পাঁচ হাত পিছিয়ে যান! পায়ের কাছে এলেই, ব্যাঙেরা প্রায় ব্যাঙ্কের ন্যায়। লিকুইডেশনে যায়, মানুষের গায়েই জলবিয়োগ করে বসে, কেমন যেন ওদের চিরকেলে বদভ্যাস, হর্ষবর্ধনের মনে পড়ে যায় হঠাৎ।

বাঁটকুল উঠে দাঁড়ায়—দেখলেন তো! ওটা ওড়বার মন্ত্র না! ভুল করে গুলিয়ে ফেলেছি! ওড়বার মন্ত্র হলো আলাদা। ডমরু ডিমি ডিমি ডিণ্ডিমো বোলে। এই হলো আসল ওড়বার মন্ত্র।

কী বললে? ডমরু ডিমি ডিমি—? বিদ্যার্জনে গোবরার অগাধ আগ্রহ। একবার ফেল করে আবার পাশের প্রত্যাশায় পুনরায় পড়া নিতে সে পরাঙ্মুখ নয়।

ডিণ্ডিমো বোলে, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন! ওড়বার মন্ত্র দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ওড়বার মন্ত্রণা দেয়। দেখতে পারেন আরেক-বার। আর একবারই তো!

হর্ষবর্ধন ছুটে এসে জাপটে ধরেন গোবরাকে—না, না, গোবরা! খবরদার না! উড়তে যাসনে আর! এবার উড়লে আর তোকে বাঁচাতে পারবো না! কাছা আটকালেও নয়।

নতুন করে পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে লটপট সিংও তার অসম্মতি জানায়—ওইসা মৎলব ফিন্ মৎ ফাঁদিয়ে বাবুজি! গোবরার এবং পাগড়ির দুজনের মুখ চেয়েই সে বলে।

আর—বারম্বার উড়লে গাছটার ওপরেও অবিচার করা হয় নাকি? ক'বার একজনের পক্ষে অপরের ঝক্কি নেওয়া সম্ভব? সামান্য একটা পেয়ারা গাছ বইতো নয়! গাছের তরফে ওকালতির সঙ্গে জজিয়তির যুক্তি জুড়ে দিয়ে হর্ষবর্ধন তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করেন।

গোবর্ধন বাঁটকুলকে ভেংচি কেটে দেয়—মন্ত্র না ছাই! ও হচ্ছে ডিমের মন্ত্র! কাঁচকলা!

না উড়বেন, নাই উড়বেন! বয়েই গেলো আমার! বাঁটকুল ঠোঁট উল্টে দেয়—এক্ষুনি নিজে উড়ে দেখিয়ে দিতে পারি, হ্যাঁ।

হর্ষবর্ধন বলেন—সে কথা মন্দ না। তুমি নিজে উড়ে দেখতে পারো বরং! তোমার বেলা গাছের বড়ো দরকার হবে না। আমিই নিচে থেকে রসগোল্লার মতো টুক্ করে ঠিক লুফে নিতে পারবো!

বাঁটকুল কিন্তু কী ভেবে নিরস্ত হয়। না! আজ থাক! অন্ধকার হয়ে আসছে এখন, অন্যদিন হবে, তাছাড়া সারাদিন আজ আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি, তার যোগাড় করিগে।

সেই ভালো! হর্ষবর্ধন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। গোবরাও দাদার বাহু-পাশমুক্ত হয়ে রক্ষা পায়।

বাঁটকুলের সাঙ্গোপাঙ্গ সবাই, একে একে, সুদূরপরাহত হয়ে গেলে হর্ষবর্ধন বলেন—উড়তে গেছলি কেন? ছি ছি! এতো বোকা তুই? ওড়ে আবার মানুষ! ফোতো কাপ্তেনরাই তো ওড়ে কেবল! ভদ্রলোকের ছেলের কি উড়তে আছে? ছ্যা!

তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে তো! ঠোঁট ফুলিয়ে বলে গোবরা। ভারি গলাতেই বলে—দেশে উড়ে গিয়ে, বৌদিকে বলে, দলবল সব নিয়ে এসে পড়তাম এখানে।

উদ্ধার! উদ্ধারের কথাও উচ্চারণ করিসনে! বিদেশ বিভুঁয়ে যে সব বিচ্ছু লোকের পাল্লায় পড়া গেছে তাতে আর এজন্মে উদ্ধারের আশা নেই। হ্যাঁ, এদের হাত থেকে আবার উদ্ধার!

এখানেই পচতে হবে সারা জন্ম?

উপায় কি? হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন—বরাতে যা আছে, কে খণ্ডাবে? তুমি নেপালে গেলেও এই দশা! একেই বলে কপালের লেখন!

কপালের লেখন না কচু।

বেশ, উদ্ধার হতে গিয়ে দেখলি তো? একবার বাঘের পেটে যাচ্ছিলি, আরেকবার গাছের পিঠে আটকালি! আর উদ্ধারের নামটিও করিসনে! তবে যদি, হ্যাঁ, কখনো—

দারুণ অন্ধকারের মধ্যে তিনি যেন একটুখানি আশার আলো দেখতে পান। কখনো যদি বাটপাড়েরা আসে, বলা যায় না তবে!

বাটপাড়! বাটপাড়েরা কেন আসতে যাবে? গোবরা বেশ বিস্মিতই হয়।

কেন আসতে যাবে, কে বলবে! এরা কেন এলো? না ডাকতে না সাধতে এমনিতেই ওরা এসে যায়। ঠিক জানিস, চোর থাকলে, বাটপাড়রাও আছে। চুরির ওপর বাটপাড়ি করতেই ওদের আমোদ! ওই ওদের পেশা! এক যদি ওরা এসে পড়ে, তবেই উদ্ধার!

বাটপাড়রা এসে, উদ্ধার করবে আমাদের? গোবরার চোখ ক্রমশই আরো বড়ো হয়।

এখন তো চোরাই মাল আমরা, আমাদের আর গতি কি? এখন কেউ যদি আমাদের বাটপাড়ি করে নিয়ে যায় তবে আমাদের গতিমুক্তি।

কিন্তু—কিন্তু গোবরা কিন্তু কিন্তু করে, তথাপি।

আর কিন্তুমিন্তু নেই। ঐখানেই যা আশা, ভরসা, ভায়া!

কিন্তু বাটপাড়ের হাত থেকে বাঁচবে কিসে?

আরে যাঃ! সে তো পরের ভাবনা, এখন কেন? বাটপাড়েরও আবার বড়োদাদা রয়েছেন—এমনি করে হাত-বদল হতে হতে যদ্দুর যাওয়া যায়। চাই কি, এইভাবে আসাম পর্যন্ত পোঁছে গেলেও যেতে পারি। কিন্তু সে কথা তো নয়, আমি ভাবছি কি, আমরা যে রকম লাট-করা, বস্তাপচা সস্তামাল, তাতে বাটপাড়েরা এলে হয়! সেই কথাই কেবল ভাবছি আমি।

হর্ষবর্ধন হায় হায় করেন! গোবর্ধনও হা হুতাশ করে।

চৈত্রমাসের মতো হু-হু করে দু'জনের দীর্ঘনিশ্বাস বইতে থাকে। হায় হায়। চোরের পাল্লায় পড়ে বেঘোরে মরতে হলো শেষটায়।

হর্ষবর্ধনকে হায় হায় করতে শোনা যায় একদিন।

বেঘোরে পড়েছি বলতে পারো দাদা, কিন্তু মারা পড়িনি এখনো আমরা। দাদার ভুল শোধরায় গোবরা।

মারা পড়তে কতোক্ষণ? যা সব বিটকেল লোকদের খপ্পরে পড়া

গেছে! কলকাতার থেকে কোথায় এনে ফেলেছে কন্দ্রে, তাই তো টের পাচ্ছিনে!

কোন্ মুল্লুকে কে জানে!

বাইরে বেরিয়ে ঘুরে যে একটু জানবো তারও কোনো জো নেই।

বাইরে বেরোলেই বা তুমি তা টের পাচ্ছো কি করে, দাদা? জায়গার নাম তো আর মাটির গায়ে লেখা নেই।

মানুষের মুখে লেখা রয়েছে।

মানুষের মুখে! গোবরার বিস্ময় ধরে না—মানুষের মুখে আবার মুল্লুকের নাম লেখা থাকে নাকি!

উল্লুকের মতো কথা বলিসনে। মুখে না হলেও মুখের ভাষায় বোঝা যায় না কি। দাদা জানায়, লোকেরা সব বাংলা বলছে, না আসামী বলছে, হিন্দী বলছে না উড়ে কথা কইছে তাই শুনেই তো বুঝতে পারবো কোথায় এসে পড়েছি। পুর্ণিয়ায় না আরা জিলায়, বোম্বায়ে না মাদ্রাজে...না, আর কোনো বেয়াড়া জায়গায়।

বোম্বাই নয়, আমি হলপ করে বলতে পারি। বলে গোবরা, বোম্বাই কলকাতার থেকে হাজার মাইল দূরে। এরা তো আমাদের একশো মাইল দূরে এনেছে কেবল। আর ধরো যদি মাদ্রাজই হয়...তাহলেও...

তাহলে?

তাহলে তো তুমি ধরতেই পারবে না। সেখানকার লোকেরা সব তামিল ভাষায় কথা বলে! বুঝবে কি করে? আর তাছাড়া আরো মুশকিল... গোবরা সমস্যাটা ক্রমশ প্রকট করে, সেখানে গেলে না খেয়েই মারা পড়তে হবে।

কেন, মারা পড়বো কেন? সেখানে কি বাজার হাট নেই নাকি? দোকান-পাট নেই কি সেখানে? খাবার কিনে খাবো আমরা।

খেতে চাইলেই বা তারা খেতে দেবে কি করে? তুমি কী চাইছো, খেতে চাইছোই কি না তাই বা তারা বুঝবে কি করে? বুঝলে তো দেবে। তামিলনাদের লোক তোমার নাদ বুঝতে না পারলে—তামিল ভাষায় কথা না কইলে তোমার কোনো হুকুমই তামিল হবে না সেখানে।

এমন সময় বাড়ির ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নেমে এলেন একজন। বাঁটকুল নয়, বিটকেল নয়, বিলকুল অচেনা।

কে মশাই আপনি? গুণ গুণ করতে করতে কোথা থেকে এলেন আবার? হতবাক হর্ষবর্ধনের কথা ফোটে।

মশাও অবশ্যি গুণ গুণ করে আর যত্রতত্র থেকে আসতে পারে বটে... গোবরা যোগ দেয়। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষের পক্ষে আকাশ ফুঁড়ে আসা—?

তাছাড়া, ছাদ থেকে এলেন যে! লোকে তো নিচের থেকেই ওপরে আসে। সদর থেকে অন্দরে...

ছাদে তো আপনি থাকেন না নিশ্চয়? ছাদে তো দেখিনি আপনাকে। ছাদে তো উঠেছিলাম একবার...। গোবরা বলে—তখনো তো কই দেখিনি আপনাকে সেখানে।

থাকলে তো দেখতেন? আমি এখানকার কেউ নই, মশাই। লোকটি জানায়—আমি এখানে এসেছি আপনাদের নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে।

অ্যাঁ! কী বললেন? আমাদের নিয়ে পালাবেন? এরাই তো আমাদের চুরি করে নিয়ে এসেছে। আমরা অপহৃত।

অপহরণের ওপর আবার আমি অপহরণ করবো। লোকটি বলে—সেই জন্যেই এসেছি আমি।

বুঝেছি। আপনারা অন্য এক চোরের দল।

না, না চোর নই আমরা...চোর বলে গাল দেবেন না আমাদের। সোচ্চার প্রতিবাদ করে সে।

ছ্যাঁচোর নাকি তবে?

ছ্যা ছ্যা করে লোকটা—ছ্যা! চোর-ছ্যাঁচোরদের আমরা মানুষ বলেই ধরি না, ওদের আবার একটা পেশা নাকি? চুরি জোচ্চুরি কি ভদ্রলোকের কাজ মশাই? এমন অপরাধ দেবেন না কখনো আমাদের।

তাহলে আপনারা?

আমরা চোরের ওপর দিয়ে যাই।

ঠিক বুঝলাম না তো...

বুঝবেন, বুঝবেন—সময় হলেই বুঝবেন! বোঝাবার সময় নেই এখন। পরে বুঝিয়ে দেবো ভালো করে। এখন, আপনারা এখান থেকে উদ্ধার হতে চান কি, চান না? জিগ্যেস করে লোকটা—বিটকেলদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ইচ্ছুক কি?

নিশ্চয় নিশ্চয়। দুই ভাইয়েরই উৎসাহ হয়—কিন্তু কি করে উদ্ধার পাবো? সদর গেটে তালা বন্ধ—দারোয়ানের কড়া পাহারা...

ওদিক দিয়েই না। ছাদ দিয়ে নিয়ে পালাবো আমি আপনাদের। যে-ভাবে আমি এসেছি। বলে লোকটা ছাদের সিঁড়ি ধরে—আসুন আমার সঙ্গে।

হর্ষবর্ধন লোকটার পিছু পিছু ছাদে উঠে দেখেন, বাড়ির এধারকার গা লাগা গাছটা যেমন গোবর্ধনকে গর্ভে ধারণ করেছিলো; পেছনদিকেও একটা গাছ তেমনি বাড়ির গা-লাগা হয়ে তাদের পৃষ্ঠে বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

দেখছেন তো গাছটা! উপর চড়াও লোকটি তাঁদের দেখায়—গাছটা

কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছাদের ওপর? এই পথেই এসেছি আমি। নেমে পড়ুন তলায়। উঠতে পারবেন তো গাছে?

তা পারবো না? বলে গাছ নিয়েই আমাদের কাজ। কাঠের কারবারী আমরা। হর্ষবর্ধন বলেন—কতো গাছকে কেটে তক্তা বানিয়ে ফেললাম বলতে গেলে। আর গোবরা? ওতো ছোটোবেলা থেকে গাছের কোলে-পিঠেই মানুষ। গাছেই বাস করতো রাতদিন।

আম পাকলেই অবশ্যি। গোবরার প্রতিবাদ—দিনরাত নয়। আর সারা বছর ধরে কখনোই নয়!

মাটিতে পা দিয়ে হাঁফ ছাড়লেন হর্ষবর্ধন—বাঁচলাম বাবা! চোরের হাত থেকে বাঁচা গেলো।

তা তো বাঁচা গেলো। কিন্তু কার খর্পরে পড়লুম এখন কে জানে!

পিছু পিছু নেমে এসে এগিয়ে এলো লোকটা—আসুন, সামনেই আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তার মোড়টাতেই।

মোটরে উঠে হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন—কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?

চলুন না একটু। দেখতেই পাবেন।

মিনিট পনেরো যেতেই একটা বড়ো শহর দেখা গেলো।

গোবরা শুধোলো—এটা কোন শহর মশাই?

শহর কলকাতা।

ঠাট্টা করছেন! অবিশ্বাসের হাসি হাসলো দু'ভাই—কলকাতার থেকে একশো মাইল দূরে গিয়ে পড়েছিলাম আমরা। আর এই একটু না আসতেই—এই টুকুনের মধ্যেই কলকাতা! বলেন কি!

বেলগেছে থেকে কলকাতা একশো মাইল—জানতুম না তো! লোকটাও কম অবাক হয় না।

বেলগেছে কি আমরা চিনিনে? বেলেগেছেই যদি হবে তো সেই হাসপাতাল—সেই পুলটা কই? বেলগেছের খালটাই বা গেলো কোথায়?

আমরা তো বেলগেছের পথ ধরে আসিনি। বিটকেলদের নজর এড়াতে ঢাকুরের দিক দিয়ে ঢুকেছি কলকাতায়!

কলকাতাই যদি হবে, তবে চিনতে পারছি না কেন? শুধোয় গোবরা, এই ক'দিনে এতোটাই বদলে যাবে নাকি?

কলকাতা এই রকমই। দিনকের দিন চেহারা পাল্টায়। ঘণ্টায়-ঘণ্টায়, মিনিটে-মিনিটে বদলে যায়। কলকাতাকে চেনা অতো সহজ নয়, মশাই!

দেখতে দেখতে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ এসে পড়ে—হ্যাঁ হ্যাঁ কলকাতাই বটে। উল্লসিত হয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন—ঐ যে ট্রাম গাড়িই কলকাতার লক্ষণ—বুঝলি গোবরা। রিক্সা, মোটর, ঠেলাগাড়ি সর্বত্রই আছে—দেশ

গাঁয়েও—কিন্তু এই টেরাম কলকাতার বাইরে আর কোথাও পাবিনে।

ট্রামের বড়ো রাস্তা ছেড়ে মেজো সেজো রাস্তা পার হয়ে গাড়িটা শেষে একটা পাড়ার মধ্যে এসে ঢুকলো।

পাড়াটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে না, দাদা? কথা পাড়লো গোবরা—আমাদের পাড়ার নতন ঠেকছে যেন। যেখানে আমরা থাকতাম সেই ধরণেরই অনেকটা—কী বলো?

তা কি করে হবে? তীক্ষ্মদৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে জবাব দেন দাদা—তবে বলতে কি, কলকাতার সব পাড়াই প্রায় এক ধাঁচের। সেই রোয়াক-ওয়ালাবাড়ি। পাশেই বস্তির মাঠকোঠা, সেই ছেলেরা রবারের বল পিটছে রাস্তায়, কিংবা ক্রিকেটের নাম করে ব্যাটম্বল খেলছে...

ব্যাটম্বল? খটকা লাগে গোবরার—কিসের অম্বল বললে!

ব্যাটম্বল। পেটে খেলে কী হয় জানিনা, তবে পিঠের ওপর একখানা খেলে অম্বল হয় নির্ঘাৎ!

ও, তুমি ব্যাটবলের কথা বলছো! তা অমন সংস্কৃত করে ব্যাটম্বল...

ও বাবা! এ রাস্তাটা এমন এবড়ো খেবড়ো কেন গো? লোকটিকে শুধোন হর্ষবর্ধন।

রাস্তার তলা দিয়ে টেলিফোনের লাইন কি কলের জলের পাইপ কিছু একটা পাতা হচ্ছে বোধ হয়, সেইজন্যে খুঁড়ে তুলে ফেলেছে রাস্তা।... গাড়ি এ রাস্তায় যাবে না আর। এটাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা নেমে পড়ি এখেনেই। আসুন।

বলছিস, আমাদের পাড়ার মতন? আমাদের পাড়াটায় কতো খোলা জায়গা পড়ে ছিলো, ছেলেরা ফুটবল খেলা জমাতো সেই সব পোড়ো জমিতে, আর এখানে? কতো উঁচু উঁচু সব বাড়ি উঠেছে—চারিধারেই—চেয়ে দেখ!

লোকটা ওদের নিয়ে একটা খালি বাড়িতে ওঠে গিয়ে।—এইটেই আপাতত আপনাদের আস্তানা। জানায় সে। কপাট নেই বাড়িটার জানলাগুলো সব হা-করা, খাঁ খাঁ করছে সারা বাড়ি। ধুলো-বালি ভর্তি নোংরা যতো ঘর জঞ্জাল ভরা। দেখে শুনে নাক সিঁটকোলো হর্ষবর্ধন—আস্তানা, না, আস্তাবল?

যা বলো দাদা। বলে ওঠে গোবরা—তা, আস্তাবলেই বা তোমার আপত্তি কি! তোমার নামে অর্ধেক তো হর্ষ (সহর্ষে সে জানায়) আর হর্স মানে ঘোড়া। ঘোড়ার পক্ষে আস্তাবলই তো ভালো!

এমন অবস্থায় ভায়ের রসিকতার প্রয়াসে দাদার পিত্তি জ্বলে যায়। গোবরার কথার কোনো জবাব না দিয়ে লোকটাকেই তিনি বলেন—তবে

আমার বাকি অর্ধেকের জন্যে একটা গোয়ালঘর দেখুন তাহলে?

গোয়ালঘর?

আস্তাবলেই আমার চলে যাবে বেশ, কিন্তু ওর তো এখানে পোষাবে না। ওর জন্যেই বলছিলাম।

আপনার ভায়ের জন্যে গোয়ালঘর দেখতে বলছেন?

গোবরা ওর নাম। গোবরা তো গোবরেরই অপভ্রংশ। ওরা গোয়ালঘরেই পরিত্যক্ত হয়। পড়ে থাকতেই আমরা দেখতে পাই।—মানে, ঐ সব অপভ্রংশ।

লোকটা কিন্তু এসব রসিকতার ধার দিয়ে যায় না, সে বলে—তা যাই বলুন! গোয়ালঘরই হোক, আর আস্তাবলই হোক, আপাতত এখানেই আপনাদের গুম করে রাখতে হবে।

গুম? কথাটা যেন বোমার মতোই দুম করে পড়ে ওদের সামনে।

—আমাদের গুম খুন করা হবে নাকি? জানতে চায় গোবরা। দুই ভাই-ই ভারি গুম হয়ে যায় শুনেই।

কেন, খুন করতে যাবো কেন? খুন খারাপি করিনে আমরা। ওসব আমাদের কাজ নয়।—বলেছি না আমরা চোর ছ্যাঁচোড় না...

—কিন্তু আপনারা যে কী তাও তো বলেননি। বলেন হর্ষবর্ধন।

বলেছি না যে, আমরা চোরের ওপর দিয়ে যাই? চুরির ওপর বাটপাড়ি করি। আমরা হচ্ছি বাটপাড়।

—বুঝলাম, এতোক্ষণে, বললেন হর্ষবর্ধন। এবং বোঝার সঙ্গে ঘাড় থেকে যেন একটা একমণী বাটখারা নেমে গেলো।

আর এ জায়গাটাই বুঝি তাহলে আপনাদের সেই বাটপাড়া?

বাটপাড়াও নয়, ভাটপাড়াও নয়। এমনকি আপনার গোঁদলপাড়াও না ...বেশ ভনিতা করেই জায়গাটার বুঝি পরিচয় দিতে যাচ্ছিলো সে, এমন সময়ে বাধা পড়ে গোবরার এক চিৎকারে—ওমা!

দেয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে চেঁচায় হঠাৎ—ও দাদা? এটা যে আমাদের পাড়াই বটে? এতো আমাদেরই সেই বাড়ি গো? দেখছো না দেয়ালের গায়ে তোমার হাতের আখর......?

হর্ষবর্ধন তাকিয়ে দেখেন সত্যিই দেয়ালে তাঁর শ্রীহস্তের লাঞ্ছনা। পেন্সিল দিয়ে তাঁর হাতের স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—শ্রীশ্রীহর্ষবর্ধন।

আর তার ঠিক নিচেই গোবরার দেবাক্ষর—শ্রীমান গোবর্ধন! তাও সমানে জ্বলজ্বল করছে।

আমাদের বাড়িই বটে তো? কিন্তু বাড়ির এ কি দশা! বলতে গিয়ে প্রায় ডুকরে ওঠেন হর্ষবর্ধন—আমাদের আসবাবপত্র, খাট, পালঙ্ক, আল-

মারি, দেরাজ, তক্তপোষ, তোরঙ্গ, পাপোষ, বিছানা সোফাসেট, চেয়ার, টেবিল, এসব গেলো কোথায়?

কোথায় গেলো ফ্রিজ, ফ্যান, আলোর ফিটিংস, জানলা, দরজা খড়খড়ির পাল্লারা...। গোবরার অনুযোগ।

চুরি গেছে সব। পরিষ্কার করে দেয় বাটপাড়—কলকাতার বাড়ি খালি পেলে, মালিক না থাকলে কিছু কি থাকে নাকি? যে পায় নিয়ে পালায়। বাড়ির মালিক বাড়িতে থাকলেও রাখা যায় না, আর আপনারা তো ক'দিন ধরেই বেপাত্তা।

তাই বলে এই কলকাতা শহরের বুকের ওপর বসে এতোটাই বাড়াবাড়ি হবে?

মশাই বাড়িটা যে ফিরে এসে দেখতে পেয়েছেন এটাই আপনাদের ভাগ্য বলে ভাবুন। এখন তো শুধু আসবাবপত্তর আর দরজা জানলাই গেছে, আর দিনকতক দেরি করে ফিরলে বাড়িটারই পাত্তা পেতেন না। ভেঙে ফেলে এর ইঁট-কাঠ-কড়ি-বরগা, লরি করে সব পাচার হয়ে যেতো—পাড়ার সবার চোখের সামনেই। তখন এসে ফাঁকা জমিটাই দেখতে পেতেন খালি। আরো কিছুদিন দেরিতে এলে দেখতেন, কে এসে আপনার জায়গা দখল করে সাততলা বাড়ি হাঁকড়ে বসে আছে—নতুন প্যাটার্ণের বাড়ি দেখে চিনতেই পারতেন না তখন। আপনার এই বাড়ির কোন চিহ্ন থাকতো না। জানায় বাটপাড়।

বৌদিও চলে গেছে বাপের বাড়ি। ঘরদোর সামলাবে কে? গোবরার আফশোষ হয়, আরে, আমাদেরই সামলাবার কেউ ছিলো না। অনাথ বালক পেয়েই না ধরে নিয়ে গেছলো চোরে......।

তবেই বুঝুন! বাটপাড় বুঝিয়ে দেয় আরো—আর ঘরের বৌ ঘরে নেই বলেই ঘরদোর এতো নোংরা। ঝাড় পোঁচ করবে কে? কে মুছবে ঘরদোর আসবাবপত্তর? কথায় বলে গৃহিনী গৃহ মুছ্যতে! সে না মুছলে আর মুছবার কেউ নেই।

ঘরদোর জাহান্নামে যাক, চোখের জলই বা কে মোছায়! গোবরা যেন দাদার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয়।

চোখের জল মোছার কী হয়েছে! আমি কি কাঁদছি নাকি তোর বৌদির জন্যে? প্রাণ চায় তুই কাঁদ। ডুকরে ডুকরে কাঁদ না হয়। ভেউ ভেউ করে...ঘেউ ঘেউ করে, যেমন তোর খুশি!

তা তো বুঝলাম, কিন্তু এর রহস্যটা বুঝছিনে...। বাটপাড় আঙুল বাড়ায় দেয়ালের পানে......ঐ আপনার শ্রীশ্রী হর্ষবর্ধন! ওর মানে?

ওর মানে উনি। ঐ তো আপনার সামনেই খাড়া। উনিই হর্ষবর্ধন আর আমি......আমি!

বলাই বাহুল্য! বলে বাটপাড়—আপনাকে আর আমিত্বের বড়াই করতে হবে না। আপনিই তার পরেরটি। তাই না? আমি খবর পেয়েছিলাম যে আপনারা খুব বড়োলোক, কিন্তু এতো বড়োলোক, তা আমার জানা ছিলো না।

বড়োলোকের পেলেনটা কী। গোবরার বিরক্তিভরা প্রশ্ন।

ঐ শ্রীশ্রী! ওটা আমার ভারি বিশ্রী লাগছে। সামান্য মানুষের আগে শ্রীশ্রী? ওতো ঠাকুর দেবতার আগে থাকে গো। যেমন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ.........

কেন, উনি কি ঠাকুর নন? আমার বৌদির পতিঠাকুর তো উনিই......।

সে তো সবার বৌদিরই একটি করে আছে মশাই।

তাছাড়া উনি আমার বৌয়ের বটঠাকুরও তো বটেন! বাৎলায় গোবর্ধন।

না, মশাই না। কখনো আমি কারো বটঠাকুর টটঠাকুর না। এখনও হইনি। বিয়েই হয়নি ওই ছোকরার। তবে হ্যাঁ, ওর একটা কনে দেখবার জন্যেই আমার বৌ বাপের বাড়ি গেছে বটে। এখন কদ্দুর কী হয় দেখা যাক। হর্ষবর্ধন রুষ্ট হন।

হলে তো খুব ভালোই হয়। বাটপাড় সায় দেয় ওর কথায়—নইলে ঘরদোরের যা ছিরি হয়েছে, দু-দুটো গৃহিনী না হলে এতো সব মুছবে কে? এক জোড়াতেই কুলোয় কিনা কে জানে।

আমার বৌদির কোনো জোড়া নেই মশাই। জানায় গোবরা। বুঝলেন তো কেন উনি শ্রীশ্রী? ওই ঠাকুরগুষ্ঠির লোক বলেই।

তা, ঠাকুরগুষ্ঠির ঠিক না হলেও, এমন কি বটঠাকুরও কি বলা যায় না আমায় এখনই...। নিজের সাফাই দেন হর্ষবর্ধন এবার—তাহলেও চেয়ে দেখুন, আমার এই চেহারাটা কি বিশাল বটগাছের মতোই নয়? আর বট অশ্বত্থ এসব তো আমাদের দেশে দেবতাই। তাদের তো পুজো করে থাকে পাড়াগাঁর লোকরা! করে না?

তাহলে আপনি বটঠাকুরই বটেন মশাই। শ্রীশ্রীবটঠাকুর। আপনার ছিচরণে নমস্কার।

বাটপাড়ের নমস্কার পড়তে না পড়তেই নিচের থেকে ভারি সোরগোল উঠতে থাকে।

ডাকাত পড়লো নাকি রে! বলে বাটপাড়। ফাঁকা জানলায় উঁকি দিয়ে তাকাতে গিয়ে দেখেন, সদরে এক ছ্যাকরা গাড়ি খাড়া হয়েছে—তার মাথায় যতো রাজ্যের মালপত্তর। গাড়ির থেকে জাঁদরেল গোছের এক মহিলা নেমেছেন, তিনি দাঁড়িয়ে থেকে আঙুল বাড়িয়ে সহিস গাড়োয়ানের মারফতে মালপত্তর নামাচ্ছেন। আর সেই মহিলাটি বেজায় বচসা লাগিয়েছে গাড়োয়ানের সঙ্গে। তিনি যেমন তাঁর কড়াক্রান্তিতে কড়া, গাড়োয়ানের

গলাও তেমনই দস্তুরমতো চড়া। বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে গেছে চারধারে। সারা মহল্লায় দারুণ হল্লা।

ওমা! ডাকাতই তো বটে! বলে ওঠে বাটপাড়—না, ডাকাত পড়লে বাটপাড়রা সে তল্লাটে নেই।

বলেই সে খিড়কির পথে সটান সটকান দেয়।

কি রকম ডাকাত দেখি তো! বলে গোবরা জানলার ফাঁকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারতে গিয়ে সোৎসাহে লাফিয়ে ওঠে—ওমা! বৌদি যে! বৌদি এসে পড়েছে বাপের বাড়ি থেকে। বেঁচে গেলাম এবার, আর কোনো ভয় নেই আমাদের। এসে গেছে বৌদি।

কেবল তোর বৌদির ভয়টাই হলো যা। গোমড়া মুখে গোবরার দিকে তাকিয়ে বললেন দাদা—সেই ভয়েই থাকতে হবে এখন থেকে।

বৌদিকে আবার ভয় কিসের? লোকটা বললেই হলো? বৌদি তো সত্যিই কিছু ডাকাতে নয়। গোবরা গজরাতে থাকে, এমন ডাকসাইটে বৌদিকে আমাদের বলে কি না ডাকাত?

ঠিক বলে গেছে লোকটা। চোরে আর ডাকাতে তফাৎ থাকলেও বৌয়ে আর ডাকাতে কোনো তফাৎ নেইরে ভাই? চোর কেবল চুরি করে মাত্র আর বৌ নেয় সব কেড়ে কুড়ে। চোরের চুরি শুধু পরের ঘরে আর বৌয়ের ডাকাতি হচ্ছে নিজের বরের ঘাড়ে। এই যা? বলতে গিয়ে হর্ষবর্ধনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। তার আবার দিনে ডাকাতি!

কবির ভাষায় বঙ্গদেশ রঙ্গভরা
তবু যেন শুকিয়ে আসছে
হাসির উৎস
ট্রামে বাসে রাস্তায় পার্কে
ক্লীষ্ট গম্ভীর মুখের ছবি.........
হাসুন, একটু হাসুন
হাসির নাম জীবন, হাসিই
হল প্রাণ—
তটস্থ পথিকের মতো জীবনকে যিনি দেখেন
শেষহীন হাসির সেই রাজা
শিবরাম আপনাদের
জন্য হাজির